প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
জিতেন্দ্রনাথ বসু
প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩/১ মোহন বাগান লেন
কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ
রনেন আয়ন দত্ত

ব্লক
সিগনেট ফটো টাইপ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
তৈফুর আলী মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

দাম : চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

কোন উচ্চাশা নিয়ে এ উপন্যাস লেখা হয় নি। অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল বা দর্শনের কোন তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল না। শহর-জীবনের নিছক একটি প্রেম কাহিনী—'দুটি চোখ দুটি মন' তার বেশী কিছু নয়—দীর্ঘ দু বছর লেগেছে বইটি শেষ করতে—কিছুটা শারীরিক ও মানসিক কারণে, কিছুটা আলস্যের দরুণ। ফলে হয়তো কখনও কখনও সুর কেটে গেছে, সুতো ছিঁড়ে গেছে। আশা করছি সেটুকু পাঠক-পাঠিকার কাছে মার্জনা পাবে।

এই লেখকের

গল্প গ্রন্থ ॥ কথাকলি, আপন প্রিয়, দরবারী, পিয়াপসন্দ, কখনও আসে নি, মুক্তবন্ধ, চন্দন কুঙ্কুম।

উপন্যাস ॥ প্রথম প্রহর, লালবাই, দ্বীপের নাম টিয়া রঙ, অরণ্য আদিম, এই পৃথিবী পান্থ নিবাস।

প্রবন্ধ ॥ রূপযানী।

স্মৃতিলেখা ॥ লেখালিখি।

সালটা ভুল হতে পারে, কিন্তু তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে রত্নার। ১৫ই ফাল্গুন, বুধবার। এত ঝড় ঝাপটা, এত এত ঘটনার ঢেউ সরে গিয়ে হঠাৎ এক একদিন স্মৃতির কিনারায় যেন কার পায়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। রোদ্দুরে ঝলসানো বালির গায়ে সোনালী রঙের কয়েকটা কণিকা এক একসময় মনের চোখে চিকচিক করে ওঠে। সব ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সব কথা মনে পড়ে।

মনে পড়বার কারণও অবশ্য আছে।

ভোর থেকেই সানাই শুরু হয়েছিল সেদিন। বাঁশ বাঁধতে, ত্রিপল টাঙাতে সকাল থেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল মণ্ডপ সাজানোর ... হাঁকডাক, চিৎকার। এক পাল ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের ছুটোছুটি, হাসি ফুর্তি। নতুন সাজপোশাক, চুলে নতুন রীবন। রত্নাদির বিয়ে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে রত্নাদিকে, নারে? বর যে কখন আসবে, সেই সন্ধ্যেবেলা। মাসতুতো পিসতুতো দূর আর নিকট সম্পর্কের আত্মীয়ের ভিড়ে বিয়ে বাড়ি সরগরম ... মেয়েদের ভিড়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া যায় না। শুধু কি ছোটরা? বিয়ে হওয়া কিংবা বিয়ের-বয়স-হওয়া মেয়েরাও মিনিটে মিনিটে রঙবেরঙের শাড়ি জড়িয়ে, শাড়ি পালটিয়ে, এসেন্স মেখে, মুখে স্নো পাউডার ঘসে, গুণগুণ করছে এদিক থেকে ওদিকে।

উঠোনের দিকে জন পাঁচেক বউ জটলা পাকিয়ে বসেছে পান সাজতে। যত না পান সাজছে তারা, তার চেয়ে কথা বলছে বেশি। ক্ষণে ক্ষণে কথার ঘূর্ণি তর্কের ঝড় তুলছে।

ওদিকে একদল বসেছে বাঁধাকপি-আলু-পটলের ঝুড়ি নিয়ে।

কুটনো কুটতে। কম করে তিনশো লোকের জোগাড় রাখতে সকাল থেকে শুরু না হলে শেষ হবে কখন।

দুটো বড় বড় উনোনে জ্বালানি ঠেলতে ঠেলতে রসু দু'জন মাঝে মাঝে তাগাদা দিয়ে যায় বড়বাজার থেকে ভাড়া আনা মাছকুটোনি লোকগুলোকে। বড় বঁটিটায় বসে একমনি মাছটাকে কায়দা করার চেষ্টা করতে করতে মাছকুটোনি চটে যায় তাগাদা শুনে।

আরেকটু হলেই হাতাহাতি শুরু হত। চিৎকার শুনে ছুটে এলেন প্রকাশবাবু—বলি তোমরা ঝগড়া করবে তো কাজ হবে কখন? এগারোটা বাজতে চলল, এখনও··

রসুইকর দোষ দিল মাছকুটোনিদের।—একটাকা রোজ দিয়ে এনেছেন, মাছ সামলতে পারে না।

মাছকুটোনিরা সালিশী মানে প্রকাশবাবুকে।—দেখুন বাবু, ছাই রাখে নি আপনার হালুইকর, দু'খাবলা ছাই দিয়ে একমনি মাছ কোটা যায়, আপনিই বলুন?

না, একটা লোক দাঁড়িয়ে না থাকলে কাজ হবে না এদের দিয়ে। বড় ছেলে প্রতুলকে হাঁক ছাড়লেন।

—কোথায় ঘুরছিস সকাল থেকে? দাঁড়া এখানে, না দেখলে এরা কিছুই করবে, কাজ হবে না।

প্রতুল একটা টুল টেনে নিয়ে বসল গ্যাঁট হয়ে।

বললে, আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন, এ-সব আমরাই ব্যবস্থা করতে পারব।

—পারলেই ভালো! বলে অনর্থক একটা অভিমানের মুখভঙ্গি করে চটি চটচট করতে করতে দোতলায় চলে গেলেন প্রকাশবাবু।

দোতলায় তখন ক্রমশঃই ভিড় বাড়ছে। ভিড়ের চেয়ে চীৎকার। সকলেই ব্যস্ত। সকলেই কাজের মানুষ। কে যে কাকে কি প্রশ্ন করছে বোঝা দায়। সকলেই সকলের খোঁজ নিচ্ছে,

কে এল, কে আসে নি। খোঁজ নিচ্ছে না শুধু একজনের। রত্নার।

গায়ে হলুদের পরে সেই যে হাতে হলুদ-মাখানো সুতো আর দূর্বো বেঁধে চুপচাপ বসে আছে সে, বসেই আছে। আসতে যেতে দু'একজনের চোখ পড়ে, দু'একটা রসিকতা করেই সরে পড়ে তারা।

রত্না হাসে, উত্তর দেয় না। কেমন যেন মনের থেকে সাড়া পায় না। অথচ ছোটবেলা থেকে এই দিনটির কথা ভেবে কত না স্বপ্ন দেখেছে সে।

সব তার চোখের সামনে হচ্ছে, তবু যেন ভাসা ভাসা।

কলাগাছের চৌঘের পিঁড়িতে লাল পাড় শাড়ি পরে এসে দাঁড়িয়েছে রত্না। নাপতিনি নখ কেটে দিয়েছে, হলুদ মাখিয়ে পাঁচ এয়ো উলুধ্বনি তুলেছে। শাঁক বেজেছে। কে যেন রসিকতা করে বলেছে, এ হলুদ তোর বর নিজের গায়ে মেখে পাঠিয়েছে, বুঝলি রত্না? এ হলুদ ছোঁয়াও যা বরকে ছোঁয়াও তাই।

ছোট বউদি তত্ত্বের বাক্স খুলে দেখিয়েছে সব। লাল বেনারসী, জলচৌকি, মাদুর, দৈ, মাছ, সন্দেশ। বেসন, রূপটান, গন্ধতেল। জামা কাপড়, পানসুপারি, এলাচলবঙ্গ, ফুলের মালা, আশীর্বাদী রূপোর বাসন, থালা, থালায় ধানদুর্বো, চন্দন, রূপোর টাকা। লাল সুতোয় বাঁধা কাজললতা।

একটি একটি করে ছোট বউদি সব দেখিয়েছে, কিন্তু দেখেও দেখে নি রত্না।

রত্নার মা'রই বা সময় কোথায় এত। গরদের শাড়ি পরে পুজোআর্চা স্ত্রীআচারের ব্যবস্থা নিয়েই মেতে ছিলেন। নাড়ুকোটার কোটা-চাল মিহি করে চালা হয়েছে কিনা, গুড়, নারকেল, খোয়া ক্ষীর এসেছে? এয়োদের হুকুম দিয়েছেন, পাঁচটা নাড়ুকোটা তাল রাখ থালায়, তার ওপর নারাণশিলা। সোনার হার রেখে তেল সিঁদুর মাখিয়ে তিন জন এয়োকে বসতে হবে চাদরের

তলায়। হ্যাঁ, হয়েছে, এইবার থালাটা কপালে ঠেকাও রত্নার। একুশটা নাড়ু বানিয়ে নারায়ণের সেবার জন্যে পাঠাও, আর বাকি তোমরা খাও। ওমা আমি? হেসেছেন নিভাননী। আমি হলাম মেয়ের মা, মা যত শুকোবে, মেয়ে তত সুখী হবে।

গামলায় জল দিয়ে মোনামুনি ভাসিয়ে নাড়া দিতেই জোড়া লাগল। রত্নার ছোটবউদি সুলতা খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল।—ও ঠাকুরঝি, বরের সঙ্গে এত ভাব? মোনামুনি জোড়া লাগলেই নাকি বরকনেতে ভাব হয়, নিভাননীর মুখও খুশিতে ভরে উঠল।

কে একটা বে-বল্লা রসিকতা করল। ছেলেগুলোকে ধমক দিয়ে সরিয়ে হাসি চাপতে চাপতে পালিয়ে এলেন নিভাননী।

বিকেল গড়িয়ে পড়ল ক্রমশঃ। প্যাণ্ডেল টাঙানো শেষ হয়েছে। ইলেকট্রিকের মিস্ত্রীরা তার টেনে নিয়ে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে।

আর সানাই তো বাজছে সেই সকাল থেকে, পুরোদমে। সানাইয়ের সুরটা করুণ, মেয়ে চিরদিনের জন্যে মাকে ছেড়ে যাবে তারই কান্না যেন। কিন্তু সানাই বাজলে আনন্দে নেচে ওঠে সকলের মন। থামলে বরং চাপা কান্না থমকে আছে মনে হয়।

রত্নার কাছে কিন্তু থামলেও যা, বাজলেও তাই।

যে ঘরে সে বসেছিল তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ উঁকি মেরেই থমকে দাঁড়ালেন নিভাননী।

ডাকলেন, ও ছোট বউমা, ছোট বউমা?

—কি মা। সুলতা কাছে এসে দাঁড়াল।

—সব কি আমাকেই বলে দিতে হবে? বেশ রাগের সঙ্গেই বললেন নিভাননী।—সাজাতে হবে না রত্নাকে? ওরা তো সব আটটার মধ্যে এসে পড়বে।

সুলতা বললে, কাপড় গয়না তো ঠিক করে রেখেছি, ভাবলাম

হাতের কাজটা সেরে এসে ঠাকুরঝিকে স্নান করিয়ে এনে সাজাতে বসব। এখন থেকে সাজালে ঘামবে বসে বসে।

—বেশ তাই যাও, হাতের কাজই সেরে এস। মনে থাকলেই হল, আমাকে যেন শেষে কথা শুনতে না হয়। রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন নিভাননী।

সুলতা দেখল জনকয়েক বসে আছে রত্নাকে ঘিরে। হাতের কাজ অর্থাৎ স্বামী কেন ডাকছে দেখেই আসি। ভাবলে সুলতা।

রত্না যেমনটি বসে ছিল তেমনি বসে আছে। একটা লাল-পাড় কোরা শাড়ি পরে। কব্জিতে হলুদ সুতো আর সবুজ দূর্বো। বড় বউ অমিয়া যে ঠাট্টা করে বলেছিল, রত্নাকে ঠিক যেন ঋষিকন্যা ঋষিকন্যা লাগছে, তা যেন সত্যি।

কিন্তু সেই যে ঠাট্টা করে চলে গেছে বড় বউদি, রত্নার খোঁজ নিতে আসে নি আর।

যার বিয়ে তাকে নিয়ে যেন কারও কোন ভাবনা নেই। তোড়জোড়ের সাতটা দিন সকলে এসে ভিড় করেছে রত্নার পাশে। হাসিঠাট্টা করেছে। একটি একটি করে জিনিস কেনা হয়েছে রত্নার মত নিয়ে। স্যাকরা এসেছে, গয়নার ডিজাইন পছন্দ করতে হবে, ডাকো রত্নাকে। কাপড়ের রঙ ঠিক হয়েছে কিনা দেখাও রত্নাকে। দানের খাট আলমারি প্লেন হবে না নক্সা-কাটা, জিগ্যেস কর রত্নাকে। এমন কি দুপুরেও পাড়ার বন্ধুরা এসে বসেছে, গল্প করেছে রত্নার সঙ্গে। কিন্তু সময় যত ঘনিয়ে আসছে, যত বুক কাঁপছে রত্নার, অজানা এক আতঙ্কে, ততই একা বোধ করছে ও। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো ছাড়া আর কেউ দু'দণ্ড এসে বসতে চায় না। বাচ্চাগুলোও কথা বলে না, বোকা বোকা চোখ মেলে ঠায় তাকিয়ে থাকে শুধু রত্নার মুখের দিকে।

সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই মা মাসী বউদিরা ছুটে যাচ্ছে আর পাঁচটা কাজে। বোন আর বন্ধুর দল

নিজেরা সাজতে গেছে, সাজাবার কথা তাদেরও মনে নেই।

এদিকে জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যায় তাও অন্ধকার হয়ে আসছে। সন্ধ্যা নামছে। নিচের প্যাণ্ডেলে আলোগুলো জ্বলে উঠল সব এক সঙ্গে। ঘরের আলোটা নিজেই জ্বেলে নিল রত্না।

অতুল এদিকে অপেক্ষা করতে করতে চটে উঠছিল সুলতার ওপর। সারাটা দিন কেবল হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছে, একবার এসে তার খোঁজ নেবারও সময় নেই। চাবির থোকাটাই বা পিঠে ঝুলিয়ে বেড়ায় কেন, দিয়ে গেলেই তো পারে। কাপড়-জামা বের করে নিত ও নিজেই।

সুলতা এল হন্তদন্ত হয়ে। স্বামী রাগ করেছে কি অভিমান করেছে চোখ তুলেও দেখল না। আলমারি খুলে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় বের করে দিল।

পাঞ্জাবির বোতাম পরিয়ে দিতে দিতে বললে, নাও কাপড়টা জামাটা বদলাও। বলে না দিলে তো, তুমি যেমন মানুষ, হয়তো ওই ময়লা কাপড়েই বরযাত্রীদের সামনে গিয়ে হাজির হবে।

বলেই বোতল পরিষ্কার করতে চলে গেল সুলতা। ছেলেটাকে এখনই দুধ খাইয়ে যেতে হবে, হৈ চৈ-এর মধ্যে হয়তো সময় পাবে না, মনে থাকবে না।

মনমাতানো সুরে সানাই বেজে চলেছে তখন। সুরের তালে তালে সুলতার মনটাও নেচে নেচে ওঠে। বছর কয়েক আগেকার এমনি একটা রঙিন দিনের কথা মনে পড়ে।

কাজ সেরে রেডিয়ো শুনে শেখা কি একটা গানের কলি গুনগুন করতে করতে রত্নার কাছে ফিরে এল। এক হাতে বেনারসী, অন্য হাতে গয়নার বাক্স নিয়ে এসে দাঁড়াল ঘরের চৌকাঠে।

দেখলে, রত্না গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানলার সামনে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঠাট্টা করে সুলতা বললে, ধন্যি মেয়ে ঠাকুরঝি। বিয়ে বাপু আমাদেরও হয়েছিল, তা বলে এমন বরের পথ চেয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি নি।

ফিরে তাকাল রত্না। এক ফালি হাসি ওর ঠোঁটের গোড়ায় জ্বলে উঠেই নিবে গেল।

সুলতা বললে, খুব হয়েছে, আর লজ্জা দেখাতে হবে না। এস সাজিয়ে দিই।

লাল বেনারসীতে, ব্রোকেডের ব্লাউজে দেখতে দেখতে নতুন রূপ খুলে গেল রত্নার। গা ভরা গয়না। কপালে চন্দনের ফোঁটা দিতে না দিতে এক দল মেয়ে এসে ঢুকল। না, সাজানো ঠিক হয় নি।

বাঃ ছোট বউদি! পাড়ার কে যেন ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, নিজে যখন সাজেন তখন তো বলে দিতে হয় না, ননদটির বেলায়···

রসিকতার সম্পর্কের বুড়ি গোছের একজন টিপ্পনি কাটলে, হিংসে রে হিংসে, নন্দাইয়ের চোখে পড়বার জন্যে অমন করে সাজিয়েছে, তারপর নিজে যখন সাজবে দেখবি···

শব্দ করে হেসে উঠল বড়রা, কম বয়সের মেয়েগুলো আঁচল চেপে মুখের খিলখিলে হাসি চাপল।

সুলতাও সশব্দে হেসে উঠল।—তা বাপু, হিংসে কি একটু না হয়, তোমরাই বল?

রত্না কিন্তু তেমনি চুপচাপ। কোন কথা, কোন রসিকতাই যেন কানে যাচ্ছে না ওর।

মেয়ের দল এদিকে সুলতার হাত থেকে কনে সাজানোর ভার নিজেরাই নিয়ে নিয়েছে। এ বলে এ ভাবে সাজাও, ও বলে না, এমনি করে।

সুলতা চন্দনের বাটিটা একজনের হাতে দিয়ে বললে, তোমরাই সাজাও তা হলে, আমার এখন অনেক কাজ।

কিন্তু সরে যেতে মন চাইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। বাঃ বেশ তো মানিয়েছে এবার।

বললে, বেশ লাগছে, আমরা সব পুরনো হয়ে গেছি, তোমাদের ওসব হালফ্যাশনের সাজানো কি আমাদের দিয়ে হয়?

কে একজন হেসে উঠল। না হয় বিয়ে হয়েছে, ছেলে হয়েছে সুলতার, বয়স এমন কি বেশি তাদের চেয়ে?

সুলতা তার কথা শুনে ফিক করে হেসেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগল।

—রত্নাকে সাজানো হয়েছে ছোট বউমা?

—হ্যাঁ, এই তো সাজিয়ে এলাম। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে কি বলব মা।

মা'র মুখেও তৃপ্তির হাসি দেখা দিল।

বললেন, কেউ আছে তো ওর কাছে। কনেকে একা রাখতে নেই বিয়ের দিনে।

—একা? সুলতা হেসে বললে, ওর বোন আর বন্ধুদের ভিড়ে আমিই বসতে পেলাম না।

আরেকবার খুশির হাসি হাসলেন নিভাননী।

বললেন, যাই একবার দেখে আসি।

এসে দেখলেন। দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে গেল। সুখের আলো পড়ল মুখে, মনে।

ধীরে ধীরে সরে এলেন। এখন অনেক কাজ, বরযাত্রীরা এল বলে। আগে থেকে যোগারযন্তর রাখতে হবে। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে টের পান নি কাজের ব্যস্ততায়।

বাইরের প্যাণ্ডেলে আলোর সারি জ্বলছে বিকেল থেকেই, কিন্তু এত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে নি এতক্ষণ। হঠাৎ আলোর মালা তীব্র হয়ে উঠেছে বলেই টের পেলেন অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক।

দোতলা থেকে নীচে নেমে এসে শরবৎ তৈরি হয়েছে কিনা তদারকি শুরু করলেন। আর সেই সময়েই চিৎকার উঠল, বর এসেছে, বর এসেছে।

গাড়ির ঘন ঘন হর্ণ বাজতেই পড়ি কি মরি তুরদার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সবাই, ছুট দিল বাইরে। তিন চারটে শাঁখ বেজে উঠল একসঙ্গে।

মেয়ের দলের সঙ্গে সুলতা, বড়বউ অমিয়া, সকলেই ছুটে গেল। এক হাতে জলের ঘটি, অন্য হাতে মিষ্টির থালা নিয়ে নিভাননীও তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন।

জামাইকে বরণ করে নামাতে হবে।

জামাইয়ের মুখে মিষ্টি দিয়ে, জলের ছড়া দিতে দিতে নিভাননীর মন আনন্দে দুলে উঠল। বাঃ, বর তো বেশ দেখতে। চমৎকার মিষ্টি মুখখানা। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি শ্রী।

ঘন ঘন শাঁখ বাজলো আবার। বরকে আসরের মাঝখানটিতে নিয়ে গিয়ে বসানো হল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল মেয়েরা। সুলতা আর বড়বউও।

একমনে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ খেয়াল হতে ছুটতে ছুটতে এল সুলতা। সিঁড়ি থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করল, ঠাকুরঝি, ও ঠাকুরঝি। তোমার বরটা ভাই বেশ জলি। কি সুন্দর হাসছে।

সুলতা নিজেই বুঝি হেসে গড়িয়ে পড়বে।

কোনরকমে কপাটে ধাক্কা খেয়ে সামলে নিয়ে আবার হেসে উঠে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই চোখ গেল ভেতরে। যেখানটিতে সেজেগুজে এতক্ষণ বসেছিল রত্না।

তা হ'লে বুঝি রত্নাও জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কি বেহায়া মেয়ে বাপু···কই, না তো।

কোথায় গেল আবার। নিশ্চয়ই কলঘরে।

কলঘরের দিকে ছুটে এল সুলতা। কিন্তু, কলঘরের দরজা তো খোলা।

পাশাপাশি ঘরগুলোয় উঁকি দিয়ে সবে সিঁড়ির মোড়ে এসেছে, অন্য সবাই ফিরে এল কথা আর হাসিতে কলকল করতে করতে।

সামনে যাকে পেল সুলতা প্রশ্ন করলে, এই, ঠাকুরঝি কোথায় ?

—কে ?

—ঠাকুরঝি, রত্না। ঘরে তো নেই।

—ঘরে নেই ?

সুলতা মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বললে, না! যাই দেখি, বোধ হয় ছাদে গেছে বরকে দেখতে।

না, ঠাট্টা নয়। যেন নিজের মনকেই স্তোক দেবার চেষ্টা করে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে গেল সুলতা। পিছনে পিছনে আরও কয়েকজন।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই নেমে এল সকলে। না, ছাদে তো নেই।

নিভাননীও ততক্ষণে বরণের থালা, জলের ঘটি পুজোর ঘরে রেখে ওপরে উঠে এসেছেন।

শুনে চমকে উঠলেন।—নেই মানে ? কলঘরে হয় তো।

—না মা, কলঘর ছাদ সব দেখেছি। নীচে যায় নি তো ? কাঁদো কাঁদো গলায় সুলতা বললে।

সবাই নেমে এল নীচে। এক একজন এক এক ঘরের দিকে ছুটল। বড়বউ অমিয়া আবার গেল ছাদে। সবাই একবার করে উঁকি দিল কলঘরটায়। একই জায়গা বারবার দেখলে।

তন্ন তন্ন করে চতুর্দিক খোঁজা হল।

চিৎকার করে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন নিভাননী। জোরে নাম ধরে ডাকা যায় না। বর, বরযাত্রী পাত্রপক্ষের সকলে বসে আছে নীচে। শুনতে পাবে তারা।

ক্রমশঃ একটা আশঙ্কার—আতঙ্কের ছায়া নামল সকলের মুখে। এত যে হৈ চৈ হট্টগোল, সব যেন থেমে থিতিয়ে গেছে। সব চুপচাপ। কেউ কারও চোখে চোখ রাখতে পারছে না।

হঠাৎ মেঝের ওপরই বসে পড়লেন নিভাননী।

কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। মুখ কালো করে বসে থাকলে কি কালো মুখ লুকনো যাবে ?

নিভাননী নিজের মনেই বললেন, তখনই বলেছিলাম, একা ফেলে যেয়ো না, একা রাখতে নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিভাননী, আর সে-শব্দ শুনে মনে হল ভেঙে পড়েছেন তিনি। দু'চোখের কোণে জল দেখা দিল, দু'গাল বেয়ে জল ঝরে পড়ল।

সুলতার চোখেও জল। যাকে সামনে পেল বললে, ওকে একবার ডেকে আন।

ওকে, অর্থাৎ অতুলকে।

বড়বউ বললে, ঠাকুরপোকে ডেকে কি হবে, বাবাকে আসতে বল একবার।

প্রকাশবাবু এলেন। অতুল, প্রতুল দু'জনেই।

শুনে চমকে উঠলেন প্রকাশবাবু। তবু বিশ্বাস করতে মন চায় না।

বললেন, কোথায় আবার যাবে, দেখ একটু ভালো করে।

খোঁজ, খোঁজ। আবার খোঁজ শুরু হ'ল।

অতুল ফিরে এসে বললে, খিড়কির দরজাটা অমন হাঁ করে খোলা কেন ? এ ঘর থেকে খিড়কির দরজা—তবে কি !...

তা হলে তো চোখে না পড়বারই কথা।

ফিসফিস থেকে একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হল। আতঙ্কের ছাপ মেয়েদের মুখ থেকে গিয়ে পড়ল পুরুষ মহলে।

গায়ের ধোপদুরস্ত চাদরটার মতই সাদা হয়ে গেছে প্রকাশবাবুর মুখ। এ কি সমস্যা?

প্রতুল বললে, সামনের রাস্তাটা ঘুরে দেখে আয় অতুল, আমি যাচ্ছি খিড়কির রাস্তাটায়।

বড়বউ ঘোমটাটা আরেকটু টেনে বললে, টর্চ নিয়ে যাও, খিড়কির রাস্তাটা অন্ধকার।

সেই যে মাস তিনেক আগে পাড়ার ছেলেগুলো ঢিল ছুঁড়ে রাস্তার আলোটা ভেঙে দিয়েছিল তার পর থেকে আর সারানো হয় নি।

প্রতুল টর্চ খুঁজতে গেল, অতুল চলে গেল কাছাকাছি রাস্তা-গুলো দেখতে।

নীচে বরযাত্রীর দল। ওদিকে সানাই, সামিয়ানা, আলো। আর এদিকে কনেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কারও সাহস হয় না গিয়ে বরকর্তাকে খবরটা দিতে। সকলেরই মনে আশা, কোথায় আর যাবে, এখনই হয়তো পাওয়া যাবে। আশা নয়, দুরাশা।

অতুল আর প্রতুল, সঙ্গে যারা গিয়েছিল, সকলেই ফিরে এল। না, কোথাও কোন চিহ্ন নেই।

একটু একটু করে কি ভাবে যেন খবরটা বরপক্ষের কানেও পৌঁছল।

কে যেন বললে, সানাই বন্ধ করতে বল।

সানাইয়ের সুর হঠাৎ থেমে গেল। সমস্ত বিয়েবাড়িটা মুহূর্তের মধ্যে শ্মশানের মত নিঃশব্দ হয়ে গেল। কারও কথাই শোনা যাচ্ছে না। কেউ কথা বলছে না।

ক্রমশঃ একটা চাপা গুঞ্জন উঠল বরযাত্রীদের মধ্যে। সত্যিই খোঁজ মিলছে না, না এও একটা ভান। হয়তো শেষমুহূর্তে মত বদলেছেন প্রকাশবাবু, মেয়েকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়ে সবই অভিনয় করছেন।

কিন্তু না, তা হলে এমন দরদর ধারায় দু'চোখ বেয়ে জল পড়ত না তাঁর।

করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রকাশবাবু এগিয়ে এলেন বরকর্ত্তার কাছে। সংক্ষেপে জানালেন যা কিছু জানাবার।

বরকর্ত্তা কিন্তু প্রকাশবাবুর কান্নায় বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হল না। সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁর।

বললেন, এ ভাবে অপমান না করলেও পারতেন। আমার দিকটাও ভাবা উচিত ছিল আপনাদের।

প্রকাশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুটি নির্বাক চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না। ইঙ্গিতটা যেন বুঝতে পারলেন না।

দ্রুতপায়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মাথা ঘুরছে, কেমন যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বুকের ভেতর অসহ্য এক ব্যথা।

নিভাননী ছুটে এলেন জল আর পাখা নিয়ে। বড়বউ তেল নিয়ে এসে বুকে মালিশ করতে শুরু করলে।

একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠলেন প্রকাশবাবু। জ্ঞান ফিরে আসতেই প্রশ্ন করলেন, পাওয়া গেছে? রত্নাকে পাওয়া গেছে?

কেউ কোন উত্তর দিল না। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন নিভাননী। আর বড়বউ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই জুতোর শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে।

ছোটবউ সুলতা ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, বরকর্ত্তা দেখা করতে আসছেন।

ছুটি উদাস চোখ মেলে প্রকাশবাবু বললেন, যায় নি ওরা? চলে যায় নি?

এ কথারও কেউ কোন উত্তর দিল না।

বরকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল অতুল। নিভাননী ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বরকর্তা বেরিয়ে গেলেন অতুলের সঙ্গে। আর সকলে এক সঙ্গে এসে ঢুকলো প্রকাশবাবুর ঘরে।

ছল ছল চোখ ছুটো যেন কারও মুখের দিকে তুলতে লজ্জা পেলেন প্রকাশবাবু। শুধু অস্ফুটে বললেন, রাণী কোথায়?

রত্নার চেয়ে দেড় বছরের ছোট মেয়ে স্বপ্না। ডাক নাম রাণী। দেখতে তেমন সুশ্রী নয় রত্নার মত। গায়ের রঙ একটু চাপা, মুখচোখও তেমন ভালো নয়। পাশাপাশি দেখলে কেউ বলবে না ওরা ছু'বোন। আপন বোন।

রত্নাকে যেবারে দেখে গিয়ে খবর দিয়েছিলেন এঁরা পছন্দ হয়েছে বলে, প্রকাশবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভেবেছিলেন, রত্নার বিয়েটা সহজে ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু রাণী? ও তো তেমন সুশ্রী নয়, ওকে নিয়েই ছুশ্চিন্তা। তেমন ভাগ্য করে এসে থাকলে তবেই।

ভাগ্যের পরিহাস যে এমন হবে, কে জানত।

প্রকাশবাবু ধীরে ধীরে বললেন, রাণীকে সাজিয়ে দাও, একটার লগ্ন আর দেরী নেই।

—সে কি? বিস্মিত হলেন নিভাননী।

প্রকাশবাবুর হাসিটা বিষণ্ণ দেখাল।

বললেন, ওদের দিকটাও তো দেখতে হবে। ছেলের বিয়ে দিতে এসে কোন মুখে ফিরে যাবেন ওঁরা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ মাথা হেঁট করে থেকে সবাই বেরিয়ে গেল।

এই ভালো। এই ভালো। তবু দুর্নাম থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যাবে। অপমান গায়ে লাগবে না। বরপক্ষ বরং মহত্ত্বই দেখিয়েছে বলা যায়। তাঁরা সালঙ্কারা সুশ্রী কন্যার পরিবর্তে নিরাভরণা অসুন্দর কন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। নির্দিষ্ট কন্যার সন্ধান মিলছে না এ অপবাদ সত্ত্বেও। পণের অঙ্ক এবং সোনার ওজন নিয়ে যিনি দিনের পর দিন চিঠিপত্র লিখেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক এবং আলোচনায় কাটিয়েছেন, যাঁকে মনে মনে কিছুটা অমানুষ বলে মনে হয়েছিল প্রকাশবাবুর, তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছায় প্রকাশবাবুর অন্য মেয়েটিকে নিতে চান পুত্রবধূ করে, সোনাদানা কিছুই পাবেন না জেনেও।

একে একে সব আলো নিবে এসেছিল, সানাই চুপ করেছিল। খাঁ খাঁ করছিল অন্ধকার আর স্তব্ধতা।

আবার একটি একটি করে আলো জ্বলে উঠল। সানাই সুর ধরলো। কিন্তু কেমন যেন বেতালা সুর। এর চেয়ে সানাই না বাজলেই যেন ভালো ছিল।

নিমন্ত্রিতদের অনেকেই তখন চলে গেছে। পাড়ার মেয়েরাও। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো কেউ বা ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ কেউ ভয়ে এক কোণে গিয়ে বসে আছে চুপচাপ।

বড়বউ আর সুলতা চোখের জল মুছতে মুছতে সাজিয়ে দিল। রাণীকে। বউরা নিজের নিজের হাত থেকে খুলে দু'এক গাছা করে চুড়ি পরিয়ে দিল। নিভাননী বিছে হারটা খুলে মেয়ের গলায় পরিয়ে দিতে গিয়ে রাণীকে হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে কেঁদে উঠলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন অনেকক্ষণ।

তারপর বিয়ের পিঁড়িতে নিয়ে গিয়ে বসানো হল রাণীকে। শাঁখ বাজলো। তবু সব কেমন চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলছে না।

শুধু দূরে দাঁড়িয়ে পুরোহিতের মন্ত্র শুনছিলেন নিভাননী, আর থেকে থেকে চোখের জল মুছছিলেন।

নিস্তব্ধ বিবাহ-মণ্ডপে পুরোহিতের বিকৃত মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যাচ্ছে।

থমথমে আবহাওয়ার মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল। গ্রন্থিবদ্ধ বরবধূকে নিয়ে যাওয়া হল বাসরে। কিন্তু বাসর জাগানোর লোক কই? এ যেন পুতুল খেলা, প্রাণ নেই।

সুলতা এক সপ্তাহ ধরে কত কি রসিকতা ভেবে রেখেছিল, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। ইচ্ছে হল না। একে একে আবার সব আলো নিবে গেল। শুধু বাসরের একটি প্রদীপ জ্বললো সারা রাত।

কিন্তু প্রকাশবাবু, নিভাননী, বড়বউ, সুলতা কারও চোখের পাতা এক হল না। প্রতুল আর অতুলও ছটফট করল বিছানায় শুয়ে।

প্রকাশবাবু কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে পড়ে থেকে বুঝলেন ঘুম হবে না। উঠে পড়লেন। একা একা ছাদে গিয়ে পায়চারী করতে শুরু করলেন।

রত্নার মত মেয়ে বাড়ি থেকে চলে যাবে কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁর। না, ভোর হলে আরেকবার খুঁজে দেখে থানায় খবর দেওয়াই ভালো। মনে মনে ভাবলেন।

ক্রমশঃ ভোর হয়ে এল। আকাশের অন্ধকার কেটে রূপালি আলো দেখা দিল। কারও সঙ্গে চোখাচোখি হতেও যেন অস্বস্তি, মাথা হেঁট করে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নীচের তলায় একটা চিৎকার উঠল। বাড়ির ঝি চিৎকার করে কি যেন বলছে।

দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এসে দেখলেন সকলেই দুরদার ছুটে আসছে। খিড়কির দরজায় ইতিমধ্যেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কয়েকজন। আর ঝি চিৎকার করে কি বলছে।

খিড়কির দরজা খুলে ছাই ফেলতে যাবে সে, খুলেই দেখে কি, বড় দিদিমণি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

পড়ে আছে? অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে রত্না? প্রকাশবাবু এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, রত্নাই। লাল বেনারসীতে কাদা, গায়ের গয়না যেমনকার তেমনি। প্রকাশবাবু কোলে তুলে নিলেন মেয়েকে।

সকলে মিলে ধরাধরি করে খাটে নিয়ে এসে শোয়ানো হল রত্নাকে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার মত একটু একটু করে চোখ চাইল রত্না, তারপরই চোখ বুজে রইল।

কি আশ্চর্য, এত খোঁজাখুঁজি হল, অথচ খিড়কির দরজাটা দেখল না কেউ ?

দেখেছে, সকলেই দেখেছে। একবার নয়, বারবার। কিন্তু তখন তো হা করে খোলা ছিল দরজা। টর্চ নিয়ে রাস্তাটাও দেখে এসেছিল প্রতুল। তারপর কে কখন দরজাটা বন্ধ করেছিল কে জানে।

তবু সে-কথা বলতে চাইল না কেউ। কি হবে অপবাদ বাড়িয়ে। রত্না ছিল, হ্যাঁ এখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কেউ লক্ষ্য করে নি।

কিন্তু রাণী বা নতুন জামাইকে সে-কথা এখন না বলাই ভালো।

রত্না আসবে, হঠাৎ এমন আকস্মিকভাবে এসে উপস্থিত হবে, কল্পনাও করতে পারে নি তিমির।

সন্ধ্যে হতে না হতে যখন কাশী বোস লেনের সামিয়ানার নীচে আলো জ্বলে উঠল, সানাই সুর ধরল, তখন দুর্গাচরণ মিত্র রোডের দোতলা বাড়ির আলসেতে ভর দিয়ে তিমির এক মনে উদাস চোখে তাকিয়ে ছিল তারা-জ্বলা আকাশের দিকে। আর ক্ষণে ক্ষণে ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার কাশী বোস লেনের পুরনো দিনের পরিচিত বাড়িটায় উঁকি দিয়ে আসতে। রত্নার চোখে কি আনন্দের হাসি দুলছে? না ব্যথার অশ্রু?

দ্রুত পায়ে হেঁটে গেলে পনেরো বিশ মিনিটও সময় লাগবার কথা নয়। দুর্গাচরণ মিত্র রোড থেকে বেরিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে ডান দিকে মোড় ফিরলে যে রাস্তা পড়ে তার নাম হরি ঘোষ স্ট্রীট। একটু এগিয়ে গেলে বাঁ-হাতে একটা গলি—ভীম ঘোষ লেন। সে-পথে মিনিট কয়েক হাঁটলেই রত্নাদের খিড়কি।

বুকের ভেতর অসহ্য এক ব্যথা পুষে তিমিরের বারবার ইচ্ছে হচ্ছিল একবার বিবাহ-মণ্ডপটা দূর থেকে দেখে আসতে। আড়াল থেকে যদি একবার রত্নার চন্দন আঁকা মুখটা দেখে আসতে পারত।

এমনি করেই কি সব শেষ হয়ে যাবে? রত্নার বিরুদ্ধে গভীর আক্রোশে, অপরিসীম অভিমানে মন বিষিয়ে উঠছিল থেকে থেকে। বিশ্বাসের বিনিময়ে সে যেন পেয়েছে শুধুই বঞ্চনা। ব্যর্থ হয়েছে তার এতদিনের ভালবাসা।

এই দিনটির আশঙ্কাতেই যে রত্নার মুখ বার বার সাদা হয়ে গেছে, কে ভেবেছে। যতবার আতঙ্কের চোখ তুলে তার মুখের

দিকে তাকিয়েছে রত্না, ভরসা পাবার আশায়, ততবারই কৌতুকের হাসিতে রত্নার ভয় মুছে দিতে চেয়েছে তিমির। মনে হয়েছে সব আশঙ্কা বুঝি অনিশ্চিত, অহেতুক।

—লক্ষ্মীটি, হেসো না এমন করে, বল, কি করব বলে দাও আমাকে। শেষবারের মত রত্না তার দুহাত চেপে ধরে বলেছে।

তবু উত্তর দেয় নি তিমির। হেসেছে শুধু। ভেবেছে, এ সবই মিথ্যে আশঙ্কা। কখনও মনে হয়েছে, কপট আতঙ্কের অভিনয়ে রত্না বুঝি তার মন যাচাই করতে চায়। বুঝিবা প্রেমের আস্বাদ নিতে চায় নতুন করে। তাই ভেবে নিজের মনকেও স্তোক দিতে চেয়েছে তিমির। তবু সাহস করে বলতে পারে নি কিছু, স্পষ্ট ভাষায় দিতে পারে নি কোন নির্দেশ।

শুধু বলেছে, ভয় নেই রত্না, তেমন দিন যদি সত্যিই আসে, তোমার মনই উপায় বাৎলে দেবে।

কে জানতো; সে আশঙ্কা এমন ভাবে, এমন আকস্মিক ঝড়ের মত তার সমস্ত মন তোলপাড় করে যাবে।

কিন্তু প্রতিবারের মত কেন আরেকবার তার কাছে এসে দাঁড়াল না রত্না। কেন প্রকাশ করে বলল না, তাদের স্বপ্নের দিন সত্যিই শেষ হতে চলেছে।

ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে উদাস চোখ মেলে এমনি অনেক এলো-মেলো কথার জাল বুনছিল তিমির।

সন্ধ্যের আগেই দূর থেকে একবার কাশী বোস লেনের সাজানো সামিয়ানাটা দেখে এসেছে, শুনে এসেছে সানাইয়ের রেশ। এখনও যেন কানে বাজছে সে-সুর। সুর নয়, যেন চাপা কান্নার মূর্ছনা।

হঠাৎ তন্ময়তা কাটলো। কি একটা শব্দে গলি পথের দিকে ফিরে তাকাল তিমির।

গ্যাসপোস্টের নীচে ধোঁয়াটে আলো, জলে ভেজা পীচের রাস্তাটা চকচক করছে সে-আলোয়। অজগরের মত আঁকাবাকা পিচ্ছল পথের রেখাটি গিয়ে মিলেছে অন্ধকারে। শুধু রাস্তার ওপারে খোলার ছাদের বস্তিতে দুচারটে লণ্ঠনের আলো এখানে ওখানে। টুং টাং শব্দ। কাশি, হাসি।

নিরুদ্দেশ চোখে গ্যাসপোস্টের আলোয় ভেজা গলি পথটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় চমকে উঠল তিমির।

একটা ছায়া শরীর যেন এগিয়ে আসছে, একটি নারীর ছায়া।

আরও কাছে এগিয়ে এল সে। একেবারে ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নার নীচে। একবার বুঝি মুখ তুলে তাকাল।

চিনতে পেরেই কেমন যেন আতঙ্কিত, বিব্রত হয়ে উঠল তিমির। হৃৎস্পন্দনের মতই দ্রুত পায়ে নেমে এল সে। একেবারে পথের মাঝখানে। গ্যাসপোস্টের নীচে।

চোখোচোখি হল। তিমিরের সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল। আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা, বিমূঢ়তা।

এ কি দুঃসাহস। এ কি নির্বোধের মত পা বাড়িয়েছ রত্না? কেন এসেছে, এসেছে যদি তো এই বেশে কেন?

লাল বেনারসীতে সাজানো রত্নার দিকে তাকাল তিমির। সারা অঙ্গে অলঙ্কার, গালে কপালে চন্দনের ফোঁটা। যেন বিয়ের পিঁড়ি থেকে এইমাত্র উঠে এসেছে।

বিস্ময়ের স্বরে তিমির শুধু প্রশ্ন করলে, রত্না, তুমি?

হঠাৎ রাস্তার মাঝখানেই দুহাত বাড়িয়ে ঢলে পড়ল রত্না। দুচোখে ঝরে পড়ল ব্যথার অশ্রু।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিমিরের বুকে চোখ চেপে রত্না অস্ফুটে কি যেন বললে।

আশ্বাসের মত নরম একখানা হাত রত্নার পিঠের ওপর রাখলে
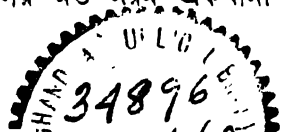
তিমির। এত যে আক্রোশ, এত যে অভিমান, সব মুহূর্তের মধ্যে উবে গেল।

তারপর হঠাৎ যেন ভয় পেল তিমির। এই অন্ধকার রাত্রিতে এই রাস্তার মাঝখানে···

আবার তিমিরকে কাছে টানতে চাইল রত্না। বিব্রত বোধ করল তিমির। ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠল ওর চোখের দৃষ্টি।

বললে, এ কি ছেলেমানুষি করছ রত্না, এ কি ভুল করছ ?

—ভুল ? দুটি অসহায় চোখ তুলে তাকাল রত্না। সব বিপদ মাথায় নিয়ে যার কাছে আশ্বাস পাবার লোভে, আশ্রয় পাবার লোভে ছুটে এসেছে, সেও তার মনের ছবি দেখতে পেল না! সজল কান্নার স্বরে রত্না বললে, তুমি, তুমিও ভুল বলছ ?

—হ্যাঁ রত্না, ভুল। কঠিন হৃদয়হীন স্বরে তিমির বললে, ফিরে যাও রত্না, ফিরে যাও তুমি।

—ফিরে যাব ? চমকে উঠল রত্না।

—হ্যাঁ, ফিরে যাও। এখনও সময় আছে রত্না, ফিরে যাও।

রত্না চোখ তুলে তাকাল আবার। অনিমেষ তাকিয়ে রইল তিমিরের মুখের দিকে।

অস্ফুটে বললে, আমার যে আর ফিরে যাবার উপায় নেই, উপায় নেই ফিরে যাবার !

ফিরে যাবার সব পথ যে রত্না নিজেই বন্ধ করে এসেছে।

অপ্রতিভের মত হাসল তিমির। বললে, না, না, তোমাকে ফিরে যেতে হবে রত্না। এ ভাবে, এমন ভাবে···

কথা খুঁজে পেল না তিমির। চুপ করে রইল। ভয়ে ভয়ে এপাশ ওপাশ দেখল। কেউ তাদের লক্ষ্য করছে কি না। কারও সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে কি না। না, কেউ কোথাও নেই। চারিদিক নিঃশব্দ নিঝুম।

ধীরে ধীরে তিমির বললে, কি করব আমি, কি করতে পারি রত্না। না, না, তুমি ফিরে যাও।

শুনল, হাসল, নিজের দীর্ঘশ্বাসে নিজেই চমকে উঠল রত্না।

ক্রমে ক্রমে তার চোখের সব জল শুকিয়ে গেল। বেদনার অশ্রু যেন জমে বরফ হয়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল সে তিমিরের মুখের দিকে, তারপর হঠাৎ হেসে উঠল অর্থহীন উন্মাদনায়।

শ্লেষের বিকৃত হাসি হেসে বললে, ঠিকই বলেছ তুমি, ঠিকই বলেছ। আমারই ভুল, বুঝতে ভুল হয়েছিল তোমাকে। জানতাম না, শেষে তুমিও কিনা···

তিমির ধীরে ধীরে বললে, চল রত্না, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—থাক। চিৎকার করে উঠল রত্না। এক ঝটকায় তার পিঠ থেকে তিমিরের হাতটা সরিয়ে দিল। বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, পথ খুঁজে খুঁজে নিজেই যখন আসতে পেরেছি, তখন ফিরে যেতেও পারব। শেষ দিনটায় এটুকু দয়া না দেখালেও চলবে।

বলেই কি যেন ভাবল রত্না। তারপর দ্রুতপায়ে যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথেই চলতে শুরু করল।

পিছনে পিছনে কিছুটা এগিয়ে এসে কখন নিজেরই অজান্তে থেমে পড়ল তিমির। উদাস অর্থহীন চোখে তাকিয়ে রইল সে যে-পথে এইমাত্র রত্না এসেছিল, যে পথে সে চলে গেছে জীবনের প্রথম রোমাঞ্চের সুতো ছিঁড়ে দিয়ে।

রত্না নিজেও তখন সুতো-ছেঁড়া ঘুড়ির মতই ভেসে চলেছে। আবছা-আলো আঁকাবাঁকা গলিতে টলতে টলতে কখন যে দুশ্চিন্তার-ভয়ের ঝড় নেমেছে তার কপালে, রত্না নিজেও যেন টের পায় নি। তন্ময়তা ভাঙতে টের পেল সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, কপালে ঘামের বিন্দু ফুটেছে চন্দনের ফোঁটার পাশে পাশে।

একটুখানি ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল রত্না। যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। সমস্ত শরীরটা হঠাৎ অসহ্য ভারি হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে কেন? কানে শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

এখনই বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়বে সে। পা দুটো কাঁপছে থরথর করে।

কোনরকমে একটা বাড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলে নিল রত্না। চুপচাপ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, অনেকক্ষণ। তারপর টলতে টলতে যে-পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে চলল।

খিড়কির দিকের অন্ধকার গলিতে ঢুকতেই দপ করে রত্নার বুক নিবে গেল।

কই, সানাই তো বাজছে না আর। প্যাণ্ডেলের আলোগুলোও প্রায় সব নিবে গেছে। শব্দ নেই, হাসি নেই, কথা নেই। ঘুমের মত নিস্তব্ধ, শ্মশানের মত নির্জন। অথচ এই একটু আগেও…

এত সময় পার হয়ে গেছে বুঝতে পারে নি রত্না। তবে কি…

এ কি! চোখে শুধুই অন্ধকার কেন? তবে কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছে রত্না? দূরের গাড়ির হর্ন, শহুরে কোলাহল অস্পষ্ট হলেও শুনতে পাচ্ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ থেমে গেল কেন? কিছুই শুনতে পাচ্ছে না কেন? দুর্বল পা দুখানি টানতে টানতে কোনরকমে খিড়কির দরজায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল রত্না। একবার বুঝি চিৎকার করে 'মা' বলে ডাকতে চেয়েছিল। মাঝপথেই স্তব্ধ হয়ে গেল সে-ডাক।

রত্না চলে যেতেই তিমিরের বুকের ওপর থেকে ভার নেমে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল যেন।

কিন্তু নিজের ছোট্ট ঘরটির জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে মন ভরে গেল তার। কি এক অসহ্য ব্যথা।

স্বপ্নকে নাগালের মধ্যে পেয়েও হাতের মুঠোয় চেপে ধরতে সাহস হল না কেন?

কি একটা শব্দে হঠাৎ একসময় চমকে উঠল। ঘড়ির দিকে তাকাল অন্যমনস্কভাবে। এ কি, এমনিভাবে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে এত সময় কেটে গেছে? কখন রাত গভীর হয়েছে, পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে, টের পায় নি তিমির।

ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে জানলার পাশে এসে দাঁড়াল আবার।

রাস্তার ওধারে পাঁচিল, পাঁচিলের ওপাশের বস্তিটা অন্ধকার, নিস্তব্ধ। তারই ফাঁকে কোথায় একটা লণ্ঠন জ্বলছিল টিমটিম করে। সেটাও কখন নিবে গেছে চোখে পড়ে নি।

বস্তির ওদিকেই হঠাৎ কোথায় যেন একটা শব্দ হল। শব্দ লক্ষ্য করে তাকাল তিমির।

অন্ধকারে একটা লোক কাঁধে মই নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বলরাম না?

—আলো। আলো!

হ্যাঁ, বলরামেরই গলা।

বলরাম তার মেয়েকে ডাকছে শুনতে পেল তিমির। প্রতিদিনই এমন সময়ে ফিরে এসে আলোকে ডেকে তোলে বলরাম।

যেদিনই তার চোখে ঘুম নামে না, সেদিনই এ ডাক শুনতে পায় সে। এমনি গভীর রাতে।

আবার ডাকল বলরাম, কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কোন শব্দ শোনা গেল না। কোন জবাব নেই।

একটু জোর গলায় আবার ডাকল বলরাম, কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাহারাওলাটা চিৎকার করে উঠল।

টহলদার সিপাইটা এতক্ষণ বোধহয় অন্ধকারে মিশে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছিল।

শিকল নাড়ার শব্দে চমকে উঠে কি যেন প্রশ্ন করলে।

উত্তর এল, এ আমার ঘর সিপাইজী, ঘরে ফিরছি।

পাহারাওলাটা বোধহয় নতুন। বলরামকে হয় তো চেনে না, ভেবেছে এত রাত্রে যখন ঘরে ফিরছে নিশ্চয় মদ খেয়ে মাতলামি করছে।

বলরাম চটে গেল। বললে আমি বাতিওয়ালা সিপাইজী। মই কাঁধে নিয়ে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে ঘুরে গ্যাসবাতি জ্বেলে আসি। থাকি এখানে, ডিউটি সেই ও প্রান্তে, দেরি হবে না ফিরতে?

—বাতিওয়ালা? অট্টহাসে হেসে উঠল পাহারাওলা। বললে, তুম বাত্তি জ্বালাও, আর তুমার ঘরই আঁধেরা?

উত্তর এল, হ্যাঁ সিপাইজী, এই হল শহরের কানুন। তুমি পাহারাওলা, তোমার ঘরেই হয় ত সিঁদ দিচ্ছে কেউ।

বুঝল কি বুঝল না, আবার অট্টহাসে হেসে উঠে বুটের শব্দ বাজিয়ে চলে গেল সিপাইটা।

খুট করে শব্দ হল, কপাট খুলে গেল। তিমির দেখলে, বলরামের মেয়ে আলো এসে দাঁড়িয়েছে লণ্ঠন হাতে।

দরজা বন্ধ হতেই আবার অন্ধকারে ডুবে গেল বস্তিটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানলা থেকে সরে এল তিমির। বিছানার ওপর বসে রইল।

ঘুম আসছে না, ঘুম আসবে না আজ।

কাছেই কোন এক বিয়ে বাড়িতে ঘন ঘন শাঁখ বাজছে। কাশী বোস লেনেও হয় তো এমনি শাঁখ বাজছে থেকে থেকে। কল্পনার চোখে তিমির যেন দেখতে পায়, রত্না আলপনা আঁকা পিঁড়িতে বসে আছে, অচেনা একটি মানুষের হাতে হাত রেখে মন্ত্র পড়ছে।

ভাবতেও অসহ্য এক ব্যথা। সব যেন শেষ হয়ে গেছে। সব বুঝি শেষ হয়ে গেল।

এ কি করল তিমির, এ কি ভুল। এতদিনের স্বপ্নে-গড়া জীবনের একমাত্র কামনাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও পাখির মত তাকে উড়ে যেতে দিল কেন? কোথায় গেল তার গ্রাম্য মনের দুঃসাহস। শহর কলকাতার আলোয় বাতাসে, ভীরু মানুষের ভিড়ে কি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে সে?

অথচ প্রথম যেদিন এসেছিল, রত্নাকে দেখেছিল ভালবাসার চোখে, সেদিন মনে হয়েছিল সব—সব করতে পারে সে, সব উপেক্ষা করে চলতে পারে শুধু রত্নাকে পাশে পেলে।

সেই অল্প বয়সের আবেগ কোথায় চলে গেছে আজ?

সেই প্রথম দিন, যেদিন প্রথম দেখেছিল রত্নাকে, সে দিনটির কথা মনে পড়ল তিমিরের।

ছোটমামার সঙ্গে এই কলকাতা শহরে এসেছিল তিমির, মানুষ হতে। কলেজে পড়বে, শিক্ষিত হবে, মানুষ হবে। কত কি স্বপ্ন। আজ মনে হয়, যেন সব মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেবার বিদ্যেটুকুই তাকে শিখিয়েছে এ শহরের আলো বাতাস।

কতদিন পার হয়ে গেছে, কত বছর।

যেদিন প্রথম এসেছিল এ শহরে তখনও গঙ্গার ওপর ওই নতুন ব্রিজটা তৈরি শেষ হয় নি। শুধু দেখা যেত তার অসমাপ্ত ত্রিকোণ কাঠামোটা হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে আকাশে উঠেছে।

ট্রেনের জানলা থেকে সেদিকে তাকিয়ে অপরিচিত এক শহরের রূপ-রসগন্ধস্পর্শ অনুভব করার জন্যে সেদিন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তিমির।

ট্রেনটা তখন ধীর গতিতে প্লাটফর্মের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুপাশে সবুজ কচুরিপানায় ঢাকা জলো ডোবা। বেগুনী রঙের ফুল কচুরীপানার, সাপের ফনার মত সবুজ পানার ফাঁকে ফাঁকে গর্বে মাথা তুলে আছে ঢং করে বাঁধা মেয়েদের খোঁপার মত। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে পানা সরিয়ে যেটুকু জল, তারই ওপর ধোপার পাট। পাথরের ওপর কাপড় পিটছে ধোপারা।

তিমির কিন্তু তখনও বুঝতে পারে নি কলকাতা এসে গেছে, কলকাতা দূরে নেই আর। পাশাপাশি অসংখ্য জোড়া জোড়া লাইন, মাঝে মাঝে সিগন্যাল, লাল নীল আলোর সঙ্কেত। দপ্‌দপ্‌ রঙিন আলোর সিগন্যাল তখন মাত্র দু'চারটে এসেছে।

সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তিমির। ওদিকে দুজন যাত্রী তর্ক করে চলেছে হিটলারের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ লাগবে কি না।

মামাতো বোন মালা হঠাৎ বলে উঠল, কলকাতা, কলকাতা!

এই নাকি কলকাতা? পড়ার বইয়ে পড়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর এই নাকি?

মনটা দমে গেল তিমিরের। মুখ ফুটে বললে, এই নাকি কলকাতা? সেই তো পানা, সেই ধোপায় কাপড় কাচে।

—ওমা, কি বোকা। মালা হেসে উঠল। দেখালে, ওই ওইখানে…

—তাই বুঝি? নতুন ব্রিজের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ ভাবটা লুকোবার চেষ্টা করলে তিমির। তারপর বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইল, যেদিকে ইস্পাতের কাঠামোর কোণ দুটো দৈত্যের মত হাত তুলে আছে। তারও ওপাশে কি আছে, কেমন সে আজব শহরটা, জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল।

গোলমাল হৈ চৈ, কুলিদের ভিড় পার হয়ে, রাশি রাশি ফিটন ট্যাক্সি, মানুষের পাশ কাটিয়ে কখন যে সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসেছিল সে, ছোটমামার পাশে, ভাল করে আজ আর মনেও পড়ে না তিমিরের।

শুধু মনে আছে, পুরনো পন্টুন ব্রিজের ওপর দিয়ে খটাখট খটাখট ছুটে চলেছে ঘোড়ার গাড়িটা। চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলেছে গঙ্গার জল, স্টীমার, নৌকোর সারি।

মালা হঠাৎ বললে, ওই দেখ তিমিরদা, ওইখানে নতুন ব্রিজ হবে, কাজ চলছে।

—তাই বুঝি। বিস্ময় যেন কাটতে চায় না তিমিরের। সতেরো বছরের তিমিরের কাছে পনেরো বছরের মালা যেন কত বড়, কত কি জানে। মালা যে এখানেই জন্মেছে, মানুষ হয়েছে।

ছোটমামাও ওর ভাবগতিক দেখে হাসলেন।—জান তিমির, ট্রেনের প্রত্যেকটি টিকিটে যে এক পয়সা করে বেশি নেয়, তা এই পুল তৈরির জন্যে।

মাত্র এক পয়সা করে নিয়ে এত বড় পুল হবে? আজব শহরের আজব কথা যেন। আর এত মানুষ, কোত্থেকে এল, কেন এল?

হঠাৎ কানা বাউলের গানটা মনে পড়ে গেল:

মানব শহর কোলকাতা কেতা চমৎকার।
শহরের দুই ধারে দুই গ্যাসের বাতি
সোনার শহর দীপ্তকার॥

ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় তিমির হঠাৎ প্রশ্ন করলে, গ্যাসবাতি কোনগুলো রে মালা?

খিলখিল করে কৌতুকে বেণী দুলিয়ে হেসে উঠল মালা।—একেবারে অজ পাড়াগেঁয়ে ছেলে তুমি তিমিরদা। গ্যাসবাতি দেখ নি, ওই ত রাস্তার ধারে ধারে।

একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে তুমি তিমিরদা। কথাটা

গিয়ে বুকে বিঁধল। যা দেখে নি আগে, চিনবে কি করে? মালা কি বাকোশ ফুল চিনত? আকন্দ কাকে বলে জানত? তবে?

না, আর কিছু জিগ্যেস করবে না সে। গুম হয়ে বসে রইল তিমির। এদিকে পণ্টুন ব্রিজ পার হয়ে গাড়িটা কখন জল-কাদা-পাথরের স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে নানা আঁকাবাঁকা রাস্তা পার হয়ে এসে একটা ছোট গলিতে ঢুকেছে লক্ষ্যও করে নি তিমির।

হঠাৎ গাড়িটা থেমে পড়তেই তন্ময়তা ভাঙল। প্রথমে ছোট-মামা, তারপর মালা, পিছনে পিছনে তিমিরও নামল।

গাড়ি থেকে নেমেই তিমির দেখলে কপাটে ঠেস দিয়ে মালারই বয়সী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। বোধহয় তার হাবভাব দেখে।

মালা এগিয়ে গেল তার দিকে।—কবে ফিরলি রে রত্না?

রত্না? বেশ নাম তো!

রত্নার দিকে আরেকবার চোখ তুলে তাকাতেই দেখলে, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি, ছেঁড়া কোট, উস্কখুস্ক চুল একটা লোক বেরিয়ে এসে মালপত্র নামাতে শুরু করেছে।

মালা সেদিকে ইশারা করে বললে, আমার মাস্টারমশাই, প্রণাম কর তিমিরদা। বলে নিজেও প্রণাম করল।

'রত্না' নামটা কিন্তু তখনও মনে মনে নাড়াচাড়া করছে তিমির। দুপুরে একসময় একা পেয়ে মালাকে প্রশ্ন করলে, রত্না কে রে মালা?

কাশী বোস লেনের বাড়িতে এসে শহরের পরিবেশটা নতুন মনে হল না তিমিরের, যতটা মনে হল কলেজে ভর্তি হয়ে। পড়াশুনোর কথা নেই কারও মুখে। শুধু মিটিং, বন্দে মাতরম্, গান্ধীজী কি বলেছেন। আর নয়ত হিটলার, মুসোলিনী, চেম্বারলেন।

মালাদের বাড়ির চালচলনটাও একটু বেখাপ্পা লাগত তার। মাস্টারমশাইয়ের আসল কাজটা মালা এবং তিমিরকে পড়ান না বাজার-সরকারী, বুঝতে পারত না তিমির। ভদ্রলোক পড়ে থাকতেন সিঁড়ির তলার একটা অন্ধকার ঘরে, সকাল দুপুর বিকেল পাঁচ ছটা ট্যুইশনি করতেন, সকালে বাজার করে দিতেন মালাদের বাড়ির, ফাইফরমাশ খাটতেন এটা ওটা।

প্রথম প্রথম কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করত তিমির। একজন শিক্ষিত মানুষকে টাকা রোজগারের জন্যে এ-ভাবে শহরের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হত। তা হলে আর কেন এসেছে সে পড়াশুনো করতে? মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী পুত্র থাকত দেশে, মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন তিনি।

—মাস্টারমশাই দেশে যান না? মালাকে জিগ্যেস করেছিল তিমির।

মালা হেসে বলেছিল, যান। একবার পুজোয়, আরেকবার বড়দিনে।

—কেন বল তো? এই কটা টাকার জন্যে কলকাতায় পড়ে থাকেন? কেমন যেন আশ্চর্য হয়েছিল তিমির।

আর মালা বলেছিল, তা নয় তিমিরদা, কি জান, মাস্টারমশাই কলকাতা ছেড়ে থাকতে পারেন না।

ছোটমামাও সেই কথা বলতেন। বলতেন, দেখিস একদিন তুইও কলকাতা ছেড়ে থাকতে চাইবি না। এখানকার বাতাসে নেশা আছে।

সত্যিই হয় তো তাই। কলকাতার হাওয়ায় নেশা লাগে। যেমন রত্নার কথায়, রত্নার হাসিতে।

মাঝে মাঝে মাস্টারমশাইয়ের কাছে অঙ্ক বুঝে নিতে আসত রত্না। যত না অঙ্ক করত, গল্প করত তার চেয়ে বেশি। কিন্তু সেই সময়টুকু বেশ লাগত তিমিরের। পরপর ছুদিন সে না এলে তিমিরের কেমন যেন ভাল লাগত না।

কিন্তু এই ভাল লাগাটুকু যে অন্যায়, তা মনে হত না। কেন মনে হবে? মালাকেও তো ভাল লাগে, কলেজের বন্ধু অরুণাভকেও ভাল লাগে। যেমন কলকাতাকে ভাল লাগে মাস্টারমশাইয়ের।

শুনে হেসেছিল অরুণাভ। চশমার ভেতর বাঁ-চোখটা একটু কুঁচকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিমিরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলেছিল, সাবধান, ভাললাগা থেকে ভালবাসা কিন্তু ওয়ান স্টেপ।

তিমির গম্ভীর হয়ে বলেছিল, কলকাতা কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগে না। ছুটিটা হলে গ্রামে ফিরে স্বস্তি পাব।

—কেন, সেখানে প্রেমট্রেম আছে বুঝি কারও সঙ্গে?

কথাটা শুনে যত না খারাপ লেগেছিল তার চেয়ে লজ্জা পেয়েছিল বেশী।

অরুণাভ হেসেছিল ওর ভাবগতিক দেখে।

পকেট থেকে প্যাকেট, প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ফস করে দেশলাই জ্বেলে অরুণাভ বলেছিল, তুই একেবারে সেই পাড়াগেঁয়ে ভূতই থেকে যাবি দেখছি।

বলে পকেট থেকে একটা চামড়ার ব্যাগে আঁটা ছবি দেখিয়েছিল অরুণাভ।

—কেমন দেখতে ?

আপনা থেকেই তিমিরের মুখ থেকে বের হল, সুন্দর, খুব সুন্দর।

—কে বল তো ?

তিমির উত্তর দিলে, কি জানি ! বোন ?

—দূর্। কি রে তুই। চোখ বুজে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করলে অরুণাভ।

বুঝতে পেরেও কেমন এক রহস্য। তিমির ধীরে ধীরে বললে, তুই ওকে ভালবাসিস ?

হ্যাঁ।

—ও তোকে ভালবাসে ?

—হ্যাঁ। হাসল অরুণাভ।

অজানা এক রহস্যের ঘরে যেন উঁকি দিচ্ছে তিমির। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলে, তারপর ধীরে ধীরে বললে, ভালবাসা হল কি করে বল তো ?

—কি করে আবার, আলাপ হল, ভাল লাগল, তারপর প্রেম।

বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই কাটতে চায় না। তিমির বড় বড় চোখে অরুণাভর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আলাপ হলেই ভালবাসা হয় ?

অরুণাভ হাসল। কোন উত্তর দিলে না।

প্রেম, ভালবাসা। অনেক শুনেও কিছুই বুঝতে পারে না তিমির। ও যেমন গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে ছটফট করে, তেমনি এক নেশা ? কে জানে !

বোকা বোকা চোখ মেলে তিমির বললে, সত্যি ভালবাসা হয় ? ও সব তো শুধু নভেলে লেখা থাকে।

অরুণাভ হাসল।—প্রথম প্রথম ত 'আপনি' বলতাম তোকে,

'তুই' হলি কি করে? তুই এত অন্তরঙ্গ হয়ে গেলি, আর একটা মেয়ে হতে পারে না?

তিমির হেসে বললে, কি জানি!

অরুণাভ বললে, ও-সব বই-মুখস্থ বিদ্যেতে বোঝা যায় না, বুঝলি? প্রেম কি জানতে হলে প্রেমে পড়তে হয়।

প্রেম, প্রেম, প্রেম। সমস্ত দিন ওই একটা কথাই বারবার ঘুরপাক খেল তিমিরের মনের চারপাশে। কি যেন এক অজ্ঞাত রোমাঞ্চ, কি এক অনাস্বাদিত রস!

বাড়িতে, দোতলার ঘরটিতে ফিরে এসেও ছোট্ট পড়ার টেবিলে দু-হাতে মাথা গুঁজে বসে রইল তিমির। অন্যদিনের মত পড়ায় মন বসল না।

ছোট্ট ঘরখানার একদিকে খাটের ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে বিছানাপত্তর, অপরিষ্কার চাদর। দেয়াল ঘেঁষে ট্রাঙ্কের ওপর ট্রাঙ্ক। কোথাও এক কোণে ঝাঁটা, কোথাও বা টুকিটাকি আজেবাজে জিনিসপত্তর।

দুহাতের ফাঁক থেকে মাথা তুলে সারা ঘরটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বিরক্তিতে মন ভরে গেল।

মালাকে ডাকবার জন্যে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াতেই তিমির দেখলে, ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে আসছে মালা।

তিমিরকে দেখেই হাঁপাতে হাঁপাতে মালা চাপা গলায় বললে, তিমিদ্দা, টেবিলটা গুছিয়ে নাও শীগগির।

—কেন রে? সারাদিন এমনি পড়ে রইল, এখন এত তাড়াহুড়া কেন? একটু যেন অভিমানের স্বরেই বললে তিমির।

কিন্তু তিমিরের কথা শোনবার জন্যে মালা ততক্ষণ অপেক্ষা করে নেই। ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকেই ওলট পালট করা তোশক

বালিশ ঠিক করে, ধোপদুরস্ত একখানা চাদর পেতে দিয়ে দু-মিনিটের মধ্যে ঘরখানাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে সে।

টেবিলের বইপত্তর গোছাতে গোছাতে মালা বললে, রত্নার মা আসছে।

মনে মনে হাসল তিমির। এই প্রথম নয়। এর আগেও দেখেছে সে এমন কাণ্ড। পরিচ্ছন্নতা যেন শুধু বাইরের লোককে দেখাবার জন্যেই।

ছোটমামীমার সঙ্গে রত্নার মা, আর রত্নার ছোট বোন রাণু এসে ঢুকল যখন, তখন ট্রাঙ্ক বাক্স আসবাব বিছানায় ঠাসা ঘরখানায় শ্রী ফিরে এসেছে।

ধীরে ধীরে বই হাতে বেরিয়ে এল তিমির। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল বৈঠকখানা ঘরটায়। এসে দেখলে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে খুব হাত পা নেড়ে গল্প করছে রত্না।

খিলখিল করে হেসে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, তিমিরকে দেখেই হাসিটা থেমে গেল।

চট করে একটা খাতা খুলে রত্না বললে, আগে এটা বুঝিয়ে দিন মাস্টারমশাই।

তিমিরের তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। ফিরে যাওয়াও চলে না, ঢুকতেও লজ্জা। এই এতটুকু একটা মেয়ে রত্না, অথচ তাকে দেখে কেন যে এত লজ্জা তিমিরের, নিজেই বুঝতে পারে না ও।

মাস্টারমশাই খাতা থেকে একবার চোখ তুলে ডাকলেন, এস তিমির।

কোনরকমে মাথা নীচু করে রত্নার মুখোমুখি এসে বসল তিমির, টেবিলের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে।

আর অঙ্কের খাতা থেকে আড়চোখে তিমিরের মুখের দিকে তাকিয়ে লুকিয়ে হাসল রত্না।

মাস্টারমশাই তখন একমনে অঙ্ক কষে চলেছেন।

ধাপে ধাপে জিগ্যেস করেন, বুঝতে পারছ?

রত্না ঘাড় নেড়ে বলে, হুঁ।

কিন্তু তার চোখ দুটো তখন ক্ষণে ক্ষণেই দৃষ্টি ফেলছে তিমিরের মুখের দিকে।

সিভিক্সের পাতায় মন দেবার চেষ্টা করছিল তিমির। রত্না কি করছে, কোন্‌দিকে তাকিয়ে আছে লক্ষ্য ছিল না তার।

হঠাৎ পায়ে কি একটা লাগতেই পা-টা সরিয়ে নিল তিমির।

—ম্যালথাসের থিওরিটা, মাস্টারমশাই···

কি যেন বলতে যাচ্ছিল তিমির, আবার কি পায়ে ঠেকতেই চমকে উঠে পা সরিয়ে নিয়েই টেবিলের তলায় উঁকি দিল।

বেড়াল না কি?

রত্নার পা ততক্ষণে যথাস্থানে ফিরে গেছে।

বিস্মিত চোখে রত্নার মুখের দিকে তাকাল তিমির। তারপর মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে। দেখলে, মুখ টিপে ফিক করে হেসে ফেলেই পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করছে রত্না। যেন কিছুই জানে না। আর মাস্টারমশাই নিজের মনেই খাতার পাতায় অঙ্ক কষে চলেছেন।

—হ্যাঁ, কি বলছিলে? থিওরি অফ পপুলেশন?

সমস্ত শরীরে মনে ঝড় বয়ে গেল তিমিরের। মাস্টারমশাই কি বোঝালেন কিছুই কানে গেল না। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ঘুম এল না তিমিরের। এক একবার মনে হল কিছুই তো নয়, নিছক রসিকতা। তবু মনের মধ্যে এমন একটা রোমাঞ্চ জাগে কেন?

তুচ্ছ এইটুকু অর্থহীন একটা ঘটনা। কিন্তু কোন একজনকে না বলে যেন শান্তি নেই। তা নয়, এতদিনে যেন শান্তি পেল

তিমির। অরুণাভর ব্যাগে-আঁটা সেই ছবিটা দেখার পর, অরুণাভর মুখে সেই অবিশ্বাস্য গল্পটা শুনে, কেমন যেন নিজের কাছেই সে ছোট হয়ে গিয়েছিল। তার মনের মধ্যে অরুণাভ যেন একটা অভাববোধ জাগিয়ে দিয়েছিল।

পরের দিন রবিবার। সোমবারেই আবার দেখা হবে অরুণাভর সঙ্গে। কিন্তু একটা দিন অপেক্ষা করাও দুঃসহ ঠেকল। তুচ্ছ হোক, তবু ঘটনাটা অরুণাভকে না বলে যেন শান্তি নেই।

মনে পড়ল ডিডাক্‌টিভ লজিকের পিছনে নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে তাদের বাড়ি যাবার জন্যে বলেছিল অরুণাভ। ঠিকানাটা এক টুকরো কাগজে লিখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিমির।

রাস্তাটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল, সময় লাগল না বাড়িটা খুঁজে বের করতে।

বিরাট চারতলা বাড়ি।

লোহার ফটকের দু-মাথায় দুটো সিংহ মূর্তি। সামনে অনেকখানি ফুলের বাগান। বাগানে একটা মার্বেলের স্ট্যাচু।

অরুণাভরা বড়লোক, কলকাতা শহরেও এক-ডাকে চেনবার মত ধনী তার বাবা, তা জানত তিমির। কলেজের প্রফেসররা তাই একটু স্নেহের চোখে দেখতেন অরুণাভকে। কিন্তু তিমির ভাবতে পারে নি এত বড়লোক অরুণাভরা। বাড়িটা দেখে তাই হকচকিয়ে গেল। নম্বর ভুল হয় নি তো?

না, ফটকের পাশে চকচকে নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে বাড়ির নাম, নম্বর।

পাশেই একটা টুলে বসে খৈনি টিপছিল দারোয়ান।

দারোয়ানকে জিগ্যেস করল তিমির, অরুণাভ আছে দারোয়ানজী?

দারোয়ান খৈনির টিপটা দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে চোখ কুঁচকে বললে, কৌন্ ?

—অরুণাভবাবু।

কি যেন ভাবল দারোয়ান, তারপর হেসে বললে, টুনুবাবু? ছোটবাবু তো ?

—হ্যাঁ।

টুনু নামটা একদিন যেন শুনেছিল তিমির।

দারোয়ান বললে, চলে যান ভিতরে। বৈঠকখানামে সরকার-বাবুকে বললে ডাকিয়ে দেবে।

ভিতরে ঢুকে পড়ল তিমির। একবার বুঝি চোখ তুলে বাড়িটার দিকে তাকাল। প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি, সামনের জানলাগুলো সব বন্ধ।

শুধু একটিমাত্র খোলা জানলায় চোখ যেতেই লজ্জায় অস্বস্তিতে মাথা নীচু করল তিমির। তবু ইচ্ছে হল আরেকবার চোখ তুলে তাকাতে।

চোখ তুলে তাকাল আবার। কিন্তু সে-মুখ ততক্ষণে সরে গেছে জানলা থেকে। দেখা পেল না তিমির সে-মুখের, দেখতে পেল না সে-রূপ। তবু মনের মধ্যে শিহরণ খেলে গেল তার। এমন রূপ, এত সুন্দর কোন নারীর মুখ বুঝি আর কখনও দেখে নি তিমির।

চকিতে দেখা হলেও তিমিরের মনে হল ভদ্রমহিলা বিধবা। ধবধবে সাদা ঘোমটার ফাঁকে গোলাপী আভায় উজ্জ্বল একটি মুখ।

আবার একবার চোখ তুলে তাকাবার ইচ্ছে হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিমিরের মনে হল ও-ভাবে দোতলার জানলার দিকে তাকান অন্যায় হয়েছে তার।

দ্রুত পায়ে বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকল তিমির। দেখলে ফরাশ-বিছানো বড় ঘরখানা একেবারে খালি, কেউ কোথাও নেই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, যদি কেউ আসে।

একবার অরুণাভর নাম ধরে ডাকল। কিন্তু কোন জবাব নেই, সাড়া নেই।

চলে যাবে কি না ভাবছিল তিমির। এমন সময় বুড়ো গোছের একটা লোক ঢুকল।—কাকে চাও?

—অরুণাভকে। অরুণাভ আছে?

বুড়ো ঘাড় নাড়ল।—আছে। বলে ঘরে ঢুকে গেল।

ফরাশের ওপর বসে পড়ল তিমির। ভাবলে, বুড়ো লোকটা হয়তো খবর দিতে গেছে অরুণাভকে।

কিন্তু মিনিট পনের অপেক্ষা করেও কেউ এল না।

মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল তিমির, রাগ হচ্ছিল অরুণাভর ওপর। বড়লোক বলেই কি তিমিরকে এ-ভাবে বসিয়ে রেখেছে নাকি?

নিঃশব্দে বেরিয়ে আসবে ভেবে উঠে দাঁড়াল তিমির। ঠিক সেই সময়েই গোলগাল ফরসা চেহারার একটি ছেলে ঢুকল।

কপাল কুঁচকে তিমিরের দিকে তাকিয়ে বছর সাত-আটের ছেলেটা প্রশ্ন করলে, কাকে চান?

—অরুণাভ। অরুণাভ আছে তো?

—আছে। বসুন। বলেই ঘরে ঢুকে গেল ছেলেটি।

আবার পনের মিনিট সময় কাটল, কিন্তু কেউ এল না, কোন সাড়াশব্দ পেল না তিমির।

অধৈর্য হয়ে উঠল তিমির। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এই শেষ, এরপর আর কোনদিন আসবে না সে অরুণাভর কাছে। কলেজে দেখা হলেও সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হতে দেবে কি না তাও ভেবে দেখতে হবে।

বিরক্ত হয়ে যখন চলে আসবার জন্যে মনস্থির করে ফেলেছে তিমির, সেই সময়ে ফুটফুটে বছর দশেকের একটি মেয়ে ঢুকল।

অদ্ভুত সাজসজ্জা মেয়েটির, ছবিতে দেখা বাইজীদের মত। ঠোঁটে লিপস্টিক। মালা একদিন যা ঠোঁটে লাগিয়ে বকুনি খেয়েছিল! গালে রুজ, চোখে কাজল কিংবা সুর্মা। দশ বছর বয়েস, কিন্তু রঙিন ওড়না আর দামী ঘাগরা পরেছে। অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটি। আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

সেও খুঁটিয়ে দেখলে তিমিরকে। তারপর জিগ্যেস করলে, কি চান? বেশ একটু তাচ্ছিল্যের স্বরেই প্রশ্ন করলে।

তিমির বললে, অরুণাভ আছে?

তাচ্ছিল্যের ভাবটা হঠাৎ সরে গেল মেয়েটির মুখ থেকে।

সহজ স্বরেই প্রশ্ন করলে, কি বলব? নাম?

—তিমির। আমি অরুণাভর বন্ধু।

এক মুখ হাসি উপছে পড়ল মেয়েটির মুখে। বললে, ও মা আমি ভেবেছিলাম চাঁদা চাইতে এসেছেন। বসুন, ছোটদাকে ডেকে দিচ্ছি। বলেই ছুটে গেল সে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই অরুণাভ নেমে এল।—কি রে, কতক্ষণ এসেছিস? তুই আসবি আমি ভাবতেই পারি নি।

হাত ধরে বললে, চল্ চল্, ওপরে আয়।

একেবারে তে-তলার ঘরটিতে তিমিরকে নিয়ে এল অরুণাভ।...

সব রাগ মুছে গেল মন থেকে। শুধু অভিযোগের স্বরে বললে, পুরো এক ঘণ্টা বসে আছি।

—খবর দিস নি কেন?

দিয়েছিলাম।

অরুণাভ হেসে বললে, ক-জনকে?

—এবার নিয়ে তিনজন।

অরুণাভ হেসে বললে, মাত্র? মীরা না দেখলে আরও জন দশেককে বলতে হত।

তিমির বিস্মিত হয়ে বললে, কেন ?

অরুণাভ হেসে বললে, আমরা সব জয়েন্ট-ফ্যামিলি কি না। এক সঙ্গে রান্না হয়, লোকে গুণগান করে। কিন্তু…

তিমির বললে, সে তো ভালই।

অরুণাভ হাসল। বললে, যাদের খবর দিতে বলেছিস, তারা কেন খবর দেবে? মীরা আমার নিজের বোন, তাই এসে জানিয়ে গেল।

তিমির চুপ করে রইল। আশ্চর্য! এই নাকি একান্নবর্তী পরিবারের আসল রূপ? শুধুই অন্নের বন্ধন, আত্মীয়তার নয়?

অরুণাভ বললে, বোস্, চা-টা বলে আসি। বলে উঠে গেল অরুণাভ।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল, পিছনে পিছনে দু-গ্লাস জল নিয়ে এসে রাখল মীরা।

তারপর খাটের বাজু ধরে মীরা তিমিরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, আপনিই বুঝি তিমিরদা?

দশ বছরের বাচ্চা মেয়েটার কাছেও লজ্জা পেল তিমির। শুধু বললে, হ্যাঁ।

—আপনি নাকি খুব ভাল ছেলে?

—তিমির লাজুক হেসে বললে, না তো।

—বাঃ রে ছোটদা বলে যে। আচ্ছা, তিমিরদা, যুদ্ধ সত্যি লাগবে?

তিমির কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাইরে থেকে কে ডাক দিল মীরাকে।

মীরা যেতে যেতে বললে, বসুন, চা নিয়ে আসি।

এবার একটু সপ্রতিভ হল তিমির। বললে, চায়ের সঙ্গে জল খাও বুঝি তোমরা?

ফিরে দাঁড়াল মীরা। বললে, উঁহু, চায়ের আগে দিতে হয় টা। টায়ের আগে দিতে হয় জল। বলে খিলখিল করে হেসে পালিয়ে গেল মীরা।

অরুণাভ বললে, ওইটুকু হলে কি হবে, ওর সঙ্গে কথায় পেরে উঠবি না।

শুধু মীরাই নয়, অরুণাভরা সকলেই যেন সপ্রতিভ, চার বছরের বাচ্চাটাও চোখেমুখে কথা বলে। সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই। ক্রমশ যত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল তিমির ততই বিস্মিত হল। এত বড়লোক, তবু কই এতটুকু অহঙ্কার নেই, দম্ভ নেই। আর কি অমায়িক ব্যবহার ব্রজবাবুর! প্রত্যেকের সঙ্গে হেসে কথা বলেন, আদর করে বসান, সন্ত্রস্ত চোখ থাকে সবসময়, আপ্যায়নে যাতে ত্রুটি না হয়। প্রথম যেদিন ব্রজবাবুকে দেখতে পেল তিমির সেদিনই মনে হল ভদ্রলোকের বুকটা যত চওড়া, হৃদয়ও বুঝি তত উদার।

কলেজ থেকে ছুটির পর অরুণাভর সঙ্গেই এসেছিল তিমির। ঘনঘন আসা-যাওয়ার ফলে ওর মন থেকে সেই প্রথম দিনের জড়তা-টুকু কখন কেটে গিয়েছিল নিজেরই অলক্ষ্যে।

গল্প করতে করতে বৈঠকখানায় ঢুকেই চুপ করে গেল তিমির।

একরাশ কাগজপত্তরে ডুবে ছিলেন ব্রজবাবু। কথা শুনেই বোধ হয় মাথা তুলে দেখলেন দুজনকে।

তারপর স্নেহের হাসি হেসে অরুণাভকে প্রশ্ন করলেন, এ ছেলেটি কে বাবা?

অরুণাভ পরিচয় দিলে, আমার বন্ধু।

—এস বাবা, এস। বস এখানে। তিমিরকে পিঠে হাত বুলিয়ে কাছে বসালেন।

একে একে প্রশ্ন করলেন, কোথায় বাড়ি, দেশ কোথায়, বাবার নাম, কি করেন, এমনি অনেক কথা।

সামান্য এক গ্রাম্য পরিবারের ছেলে, মামার আশ্রয়ে থেকে পড়াশুনা করে জেনেও বিস্মিত হলেন না ব্রজবাবু, আদরের পরিমাণ

কমে গেল না। কিন্তু এই প্রথম বুঝি তিমির অস্বস্তি বোধ করল নিজের পরিচয়ের জন্যে।

অরুণাভর কাছে কোন ক্ষুদ্রতাবোধ জাগে নি তার, কিন্তু ব্রজবাবুর কাছে পরিবারের পরিচয় দিতে গিয়ে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করলে।

ব্রজবাবু কিন্তু বুঝতে পারলেন না তার সঙ্কোচটা কোথায়। নানা গল্প জুড়ে দিলেন তিনি তিমিরের সঙ্গে। কি পড়ছে সে, কি পড়বে এরপর, বড় হয়ে কি হতে চায়।

অরুণাভকে বললেন, যাও টুনু, বাবাকে আমার কলেজ থেকে ধরে এনেছ, খাবারের ব্যবস্থা কর গে।

তিমিরকে বললেন, যাও টুনুর সঙ্গে ওপরে চলে যাও।

তিমির বিনীতভাবে উঠে দাঁড়াল।

ব্রজবাবু মিষ্টি হেসে বললেন, তোমার বাবা নেই এখানে, কিন্তু এই জ্যাঠামশাইটি আছে। যখন যা দরকার পড়বে, এসে বলো, কেমন ?

গ্রাম্যমনের বর্ণাভিমানটা দূর করতে পারে নি বলেই তিমির ব্রজবাবুকে প্রথম পরিচয়ে প্রণাম করতে পারে নি। এবার কিন্তু আপনা থেকেই মাথা নুয়ে পড়ল তার।

ব্রজবাবুকে প্রণাম করে অরুণাভর সঙ্গে ওপরে উঠে গেল তিমির।

পিছন থেকে ব্রজবাবু চিৎকার করে বললেন, মীরা-মাকে একবার পাঠিয়ে দিও টুনু।

অরুণাভ বললে, আচ্ছা।

তারপর নিজের ঘরটিতে ঢুকে হঠাৎ বললে, বাবাকে দেখলি ?

তিমির অস্ফুটে বললে, সত্যি, বড় ভালমানুষ, দেবতুল্য।

অরুণাভ গম্ভীর হয়ে গেল। কোন কথা বললে না।

নিঃশব্দে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একসময় জিগ্যেস করল, হিপোক্রেসী বানান কি রে তিমির ?

রত্নাকে প্রথম যেদিন দেখেছিল সেদিন শুধুই ভাল লেগেছিল তিমিরের। ভাল তো অনেক কিছুই লাগে। তারপর এক সময় মন থেকে তা মিলিয়ে যায়। তেমনি মন থেকে মুছে গিয়েছিল রত্নার মুখখানা। রত্নাকে ঘিরে কোন স্বপ্ন গড়ে নি তিমির, ঘনিষ্ঠ হবার কথা মনের মধ্যে উঁকি দেয় নি একবারও। বরং একটু দূরে দূরে থাকতে চেয়েছে। এমন কি অরুণাভ দিনের পর দিন যখন প্রেমের গল্প বলে গেছে, আর তিমির মনে মনে ভেবেছে কোথায় যেন সে খাটো হয়ে যাচ্ছে অরুণাভর চেয়ে, তখনও রত্নার ছবি ভেসে ওঠে নি তার চোখের সামনে।

গল্প উপন্যাসে কত কি পড়েছে তিমির, কিন্তু প্রাণের থেকে কই কোন সাড়া তো জাগে নি! মনে হয় নি একবারও, প্রেমের অভাবে জীবনকে এত দরিদ্র মনে হয়। মনে হয়েছে, প্রেমও কবিতা লেখার মতই একটা নেশা। প্রয়োজনের পৃথিবীতে তার কোন দাম নেই। গ্রামের ছেলে তো, কলকাতার অসংখ্য আকর্ষণের মাঝখানে এসে পড়ে চোখ ঝলসে গিয়েছিল তার। চুপ করে ভাববার অবসর হারিয়ে ফেলেছিল। বন্ধুদের সঙ্গে হই-হল্লা, রাজনীতি, খেলার মাঠ, সিনেমা।

দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়, ক্লান্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে সন্ধ্যের সময় বইয়ের পাতায় ঝুঁকে পড়তে না পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে।

কোনদিন মালা এসে ঠেলা দেয়, কোনদিন ছোটমামার ডাকে ঘুম ভাঙে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে এদিক ওদিক তাকায়, তারপর খেতে নেমে যায়।

কিন্তু কলেজে আড্ডার ফাঁকে যখনই অরুণাভ তার প্রেমের

দৈনন্দিন কাহিনীটুকু সরস করে বর্ণনা করতে শুরু করে তখনই মনের মধ্যে কেমন একটা বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে।

বিতৃষ্ণা ?

না। শুনতে বেশ ভালই লাগে তার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিগ্যেস করে তিমির। মনে মনে রোমন্থন করে, যেন অরুণাভ নয়, এ প্রেম-কাহিনীর নায়ক সে নিজে। অরুণাভর সঙ্গে মেয়েটির কোনদিন দেখা না হলে, কিংবা কোন ভুল-বোঝাবুঝি হলে তিমিরের মনটাও মুষড়ে যায়।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, শুনতে ভালও লাগে, শুনতে খারাপও লাগে। এক এক সময় মনে হয়, তার যেন কি নেই, কোথায় যেন অরুণাভর চেয়ে সে নীচে নেমে গেছে। অথচ অরুণাভরা বড়লোক, ধনী, এ-সব জেনেও, এমন কি ওদের সেই বিরাট বাড়িখানা দেখেও কোনদিন নিজেদের দারিদ্র্যের জন্যে লজ্জিত বোধ করে নি। কিংবা ঐশ্বর্যের দিক থেকে সমকক্ষ হওয়াটা অসম্ভব বলেই হয় তো মনের গোপনে চাপা পড়ে গেছে ঈর্ষাটুকু। ঈর্ষাই তো !

প্রেম তো অসম্ভব নয়। সেখানে কেন সে সমকক্ষ হতে পারবে না ?

-তাই মনে মনে কোন একটা হাসিমাখা মুখ কল্পনা করতে চেয়েছে তিমির। পারে নি। পথে দেখা, হঠাৎ-দেখা, কত মুখ মুহূর্তের রোমাঞ্চ জাগিয়েই মিলিয়ে গেছে। নিত্য নতুন কত মুখ জোনাকির মত জ্বলে উঠেই নিবে গেছে !

কোন একজনের প্রেমের আকর্ষণ নয়, প্রেমে পড়েছে সে এই বোধটুকুই যেন তার সব ক্ষুদ্রতা দূর করে দিতে পারে। তবু রত্নার কথা কোনদিন মনে হয় নি।

তাই সেদিনের দৃশ্যটুকু মনে পড়তেই খুশিতে হেসে ফেলল তিমির।

—হাসছো কেন গো তিমিরদা? মালা বই নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করল।

আর মালার কথায় তন্ময়তা ভাঙল তিমিরের।

সত্যি তো, পড়ার টেবিলে বসে ইতিহাসের পাতা খুলে রেখে কি সব ভাবছিল সে এতক্ষণ!

কি ভাবছিল তা কি মালার কাছে প্রকাশ করে বলা যায়!

না, শুধু একজনকেই সে-কথা বলেছিল তিমির।

অরুণাভকে। কিন্তু ঘটনাটাকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয় নি অরুণাভ। আর তাই মনে মনে তার ওপর একটু চটেই গিয়েছিল ও।

কেন চটবে না? পড়ার টেবিলের নীচে পায়ে পায়ে ঠোকর লাগাটা কি এতই তুচ্ছ ব্যাপার? এমন কিছু শিশু নয় রত্না। না বয়েসে, না চেহারায়। উদ্দেশ্য যদি না থাকবে তা হলে বার বার এমন করল কেন সে, এমন অদ্ভুত হেসে তাকাল কেন তার দিকে?

মনে মনে অনেক ভেবে নিঃসন্দেহ হয়েছে তিমির। বুঝেছে, রত্নাকে তার যতখানি ভাল লেগেছে, তাকে তার চেয়েও বেশি ভাল লেগেছে রত্নার।

রত্নার হাবভাব, কথাবার্তা, প্রতিটি ব্যবহারের মধ্যে যেন অর্থ খুঁজে পায় তিমির। কিন্তু পথ খুঁজে পায় না এগিয়ে যাবার।

হয়তো ভয়, হয়তো সন্দেহ। এক এক সময় তার মনে হয় সবই হয়তো ভুল। চোখের ভুল তার, মনের ভুল।

তবে কি রত্নাকে ভালবেসে ফেলেছে সে? আর ভালবাসার চোখে দেখছে বলেই সব-কিছুর মধ্যে অর্থ খুঁজে পাচ্ছে? নিজের মনেই বারবার বিচার করে তিমির, কিন্তু কিছুতেই যেন নিঃসন্দেহ হতে পারে না।

পড়ার টেবিলে বসে থাকাই সার হয়। পড়ায় আর মন যায় না।

একবার চারপাশটা তাকিয়ে দেখল তিমির। সমস্ত মন

বিতৃষ্ণায় বিরক্তিতে ভরে গেল। নীচের ঘরে মালা হয়তো পড়তে বসেছে মাস্টারমশাইয়ের কাছে।

নীচে থেকে ভেসে আসছে মামীমার চিৎকার। ঝিয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছেন কাপ ভেঙে ফেলেছে বলে।

এদিকে ঘরের মেঝেতে ঝাঁট পড়ে নি। এক কোণে ট্রাঙ্কের ওপর ট্রাঙ্ক সাজানো আছে, ঠিক দোকানে যেমন ভাবে থাকে তেমনি। কিন্তু ধুলো জমে আছে তার ওপর। কয়েকটা খবরের কাগজের পাতা ঝুলে আছে আলমারিটার মাথা থেকে। খাটের ওপর নোংরা তোশক, শতছিন্ন, কাল কাল লাল লাল দাগ তার এখানে ওখানে। বালিশটাতে ওয়াড় আছে, কিন্তু তাও এত ময়লা যে দেখলে ঘেন্না হয়। খাটের নীচে একরাশ থালা বাটি হাঁড়ি কড়াই।

এ সব দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তিমির। তবু আজ হঠাৎ যেন সমস্ত ঘরখানা কুশ্রী রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। এগুলোর জন্যেই যেন মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে তার, বইয়ের পাতায় মন দিতে পারছে না।

ওপর থেকে নীচে নেমে এল তিমির। সিঁড়িতে জল-কাদা প্যাচ প্যাচ করছে। নীচের কলের সামনে বসেছে ঝি, এক-কাঁড়ি বাসন সামনে নিয়ে। মাঝে মাঝে গজরাচ্ছে মামীমার উদ্দেশে। ছাই, পাতা, তেঁতুল—সব-কিছু নিয়ে কেমন একটা গা-রি-রি করে ওঠবার মত।

মাস্টারমশাই বসে আছেন বৈঠকখানা ঘরে, সামনে রত্নার ছোট বোন রানু কাগজের নৌকো বানাচ্ছে একমনে।

আবার নীচে থেকে ওপরের ঘরটায় উঠে এল তিমির।

বই খুলে বসল।

বই খুলে বসে থাকতে থাকতে কখন নিজেরই অজান্তে দুহাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে গেল মালার চিৎকারে।

—এই ওঠ, ওঠ, শীগগির ওঠ।

চমকে উঠে দাঁড়াল তিমির। জিগ্যেস করল, কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছিস কেন?

—যুদ্ধ লেগে গেছে। বাবা বলল, এইমাত্র রেডিয়ো শুনে এসেছে। হিটলার যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে।

যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ। স্কুলে কলেজে, ট্রামে বাসে, পথে ঘাটে সর্বত্র এই এক আলোচনা। আর আশ্চর্য, যুদ্ধের নামে কোন আতঙ্ক নেই কারও মুখে। আতঙ্কের বদলে উল্লাস। সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠেছে যুদ্ধের নামে।

মনে মনে সকলেই যেন যুদ্ধ চাইছিল। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়। তিমির নিজেও ভাবত, যুদ্ধ লাগলে মন্দ হয় না। লড়াই তো হবে ইংরেজ আর জার্মানে। ভারতবর্ষের গায়ে আঁচড়টুকুও লাগবে না। আর ছাতা-হাতে বুড়ো চেম্বারলেন যখন হিটলারকে তোষামোদ করার জন্যে এত ছোটাছুটি করছিল এতদিন, তখন বোঝা-ই যাচ্ছে ইংরেজের দৌড় কদ্দূর!

মালা হাসতে হাসতে একদিন বললে, জ্যাঠামশাই কী বলছিলেন জান ছোটদা?

—কে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে তিমির।

উত্তর এল, রত্নার বাবা। বলছিলেন কী, ইংরেজের সঙ্গে নাকি পারবে না হিটলার।

তিমির হাসল।—রত্নার বাবা বুঝি রায় সাহেব?

মালা হেসে বললে, তা অবশ্য নয়, তবে সরকারী চাকরি করেন তো, ভাবতেই পারেন না হিটলার কত বড়। আমি কিন্তু বলে এসেছি—দেখবেন জ্যাঠামশাই, ইংরেজ হেরে ভূত হয়ে যাবে।

তিমির সায় দিল।—যাবেই তো।

—এর পর তো আবার হিটলারের বন্ধু আছে মুসোলিনী! সে আরও বড়।

কথাটা তিমিরের কিন্তু তেমন মনঃপূত হল না। বললে,

মুসোলিনীর কথা অবশ্য বলা যায় না। অ্যাবিসিনিয়া নিতেই এত কসরত করতে হল···

মালা হেসে বললে, বাবা তো বলছিল, ওসব ভাঁওতা। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি কিছু ব্যবহার করে নি, ইংরেজ যাতে মনে করে যে মুসোলিনীর কিছু নেই।

এমন একটা সন্দেহ যে তিমিরেরও না হয়েছে তা নয়। সত্যিই তো, কেউ কি আগে থেকে নিজের শক্তি শত্রুকে দেখিয়ে দেয়!

অন্য সকলের মত তিমিরও তখন ভাবত, ইংরেজ হেরে গেলে বেশ হয়। জব্দ হয় ওরা। আর ভারতবর্ষের লোক যখন ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে এত চেষ্টা করছে, স্বাধীন হতে চাইছে, তখন যুদ্ধে জিতলে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা দিয়ে দেবে হিটলার। ইংরেজরা যাই বলুক না, আসলে ইংরেজের অন্যায়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে জার্মানী।

কলেজেও তখন প্রতিদিন ওই একই আলোচনা। এমন কি প্রফেসররাও পড়াতে পড়াতে হঠাৎ এক-একসময় যুদ্ধের খবরে চলে আসেন। আর অরুণাভ?

একখানা ফুলস্কেপ কাগজে রীতিমত একটা ম্যাপ এঁকে ফেলেছে সে।

তিমির ক্লাসে ঢুকেই দেখলে, শেষের বেঞ্চিতে কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে অরুণাভর ম্যাপের ওপর। তিমিরও এগিয়ে গেল সেদিকে। দেখলে, ম্যাপের ওপর পেন্সিলের দাগ দিয়ে দিয়ে অরুণাভ বুঝিয়ে দিচ্ছে—ওয়ারশ কোথায়, জার্মান সৈন্য পোল্যাণ্ডের দিকে কতখানি এগিয়েছে।

তন্ময় হয়ে শুনছিল তিমির। দু-একজন টীকা-টিপ্পনি করছিল ইংরেজের শক্তি সম্বন্ধে। সকলেরই তখন জাতক্রোধ ইংরেজের বিরুদ্ধে। শ্রদ্ধা শুধু হিটলারের ওপর।

অনাথ হঠাৎ বললে, নস্ট্রাডেমাস কী বলেছেন জানিস?

নস্ট্রাডেমাস কে? সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল।

ফ্রান্সের একজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, নেপোলিয়নের আগে জন্মেও ওয়াটারলুর বিবরণ দিয়ে গেছেন, আর এ যুদ্ধ যে শুরু করবে তার নাম দিয়েছেন হিস্‌টার। হিটলার আর হিস্‌টার এক। বলেছেন, যে ব্লকেড শুরু করবে সে-ই হারবে।

—কে শুরু করবে ব্লকেড?

অনাথ উত্তর দেওয়ার আগেই প্রফেসর ঢুকলেন নাম-ডাকের খাতাটা নিয়ে।

মুহূর্তে থেমে গেল হৈ-হল্লা, চিৎকার। ম্যাপখানা ভাঁজ করে পকেটে পুরল অরুণাভ। নাম-ডাকা চলেছে তখন।

—ফর্টি টু।

—ইয়েস স্যার।

—ফর্টি থ্রি।

—প্রেজেণ্ট স্যার।

—ফর্টি ফোর।

—হিয়ার স্যার।

—ফর্টি ফাইভ।

তিমির 'ইয়েস স্যার' বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলে বেঞ্চের কোণ থেকে সুরুৎ করে বেরিয়ে গেছে অরুণাভ, গিয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার ওপাশে। ইশারা করে ডাকছে অনাথকে। অনাথ তা দেখে ঠেলা দিল তিমিরকে। তিমিরও ওইভাবে সুরুৎ করে বেরিয়ে না গেলে অনাথও যেতে পাবে না।

তিমির একবার কি ভাবল, একবার তাকাল প্রফেসরের মুখের দিকে। না, অন্যমনস্ক হয়ে আছেন তিনি।

চট করে বেরিয়ে গেল তিমির, আর তার পিছনে পিছনে অনাথ। আরও অনেকে এ-দরজা ও-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রোল-কল শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, ক্লাসের অর্ধেক বেঞ্চি খালি হয়ে গেছে।

সেদিকে তাকিয়ে বুক দুরুদুরু করে উঠল তিমিরের। এই প্রথম সে ক্লাস থেকে পালিয়ে আসছে। তাই ভয় হল, খালি বেঞ্চিগুলোর দিকে তাকালেই প্রফেসর বোস সব বুঝতে পারবেন।

বুঝতে যে পারেন এবং বুঝেও যে কিছু বলেন না প্রফেসররা, এ-খবরটা তখন পর্যন্ত জানত না তিমির। তাই কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে অরুণাভকে।

অরুণাভ হেসে বললে, চল্ চল্, গুড বয় হতে হবে না আর।

অনাথ বললে, বেরিয়ে তো এলাম, কোথায় যাওয়া যায় বল্ তো?

—কেন, চায়ের দোকানে।

চায়ের দোকানেই এসে বসল তিনজনে।

কলেজের পাশেই ছোট্ট একটা চায়ের দোকান। খোপ খোপ পর্দাটানা ঘর ক-খানা, আর খোলা-মেলা কয়েকটা টেবিল চেয়ার বাইরে। কিন্তু দুপুরের এ-সময়টা তিলধারণের জায়গা থাকে না। কলেজের ছেলেরা দলে দলে আসে বই খাতা নিয়ে, চেয়ার ছাড়তে চায় না সন্ধ্যে না হলে। খদ্দের এ-সময়ে দু-চারজনই আসে, কেউ কেউ নিজের থেকেই চেয়ার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন, দু-একজনকে ইশারায় ইঙ্গিতে চেয়ার ছাড়তে বলে 'বয়', আর যারা তা সত্ত্বেও উঠতে চায় না তাদের ম্যানেজার স্বয়ং এসে অনুরোধ জানায়। সে-ক্ষেত্রে রেগে যায় তারা, অপমানিত বোধ করে, প্রতিজ্ঞা করে আর আসবে না সে দোকানে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক রোদ্দুরে টো-টো করে বেড়িয়ে আবার ফিরে আসে।

প্রথম প্রথম এই অন্ধকার ঘরটায় এসে বসতে ভাল লাগত না তিমিরের। কিন্তু দিনকয়েক যেতে না যেতেই আর সকলের

মত তারও নেশা ধরে গেল। সত্যিই যেন কী এক নেশা আছে দোকানটায়!

সমস্ত দিনটা ওই এক চেয়ারে কাটিয়ে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরতে যেন মন-কেমন করে। মনে হয়, আরও কিছুক্ষণ কাটাতে পারলে তৃপ্তি হত।

কেবল আড্ডা আর অড্ডা। কী কথা হয়? কী আলোচনা? কিছুই না, কিংবা সব-কিছুই। তর্ক, ঝগড়া, হাতাহাতি পর্যন্ত। তারপরই আবার সব মিটমাট হয়ে যায়, আবার এসে বসে সকলে, সব ভুলে গিয়ে আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

অরুণাভকে তবু কিছুটা বুঝতে পারে তিমির, কিন্তু অনাথ যেন রহস্যময় দুর্বোধ্য একটি চরিত্র। রহস্যময়ই মনে হয়েছিল যেদিন প্রথম জানল যে অনাথ তার মত সাধারণ ছাত্র নয়। রীতিমত স্কলারশিপ-পাওয়া ছেলে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে দু-চারজন প্রফেসারের ক্লাস যখন করত, তখন দেখত প্রফেসরের যে-কোন প্রশ্নের উত্তর কেমন অবলীলায় দিত অনাথ। যেন সবই সে জানে, সবই পড়েছে।

বলতও তাই। বলত, বইয়ের বাইরের নতুন কিছু তো শুনতে পাব না ক্লাসে থেকে, কী হবে ক্লাস করে? তার চেয়ে আড্ডা দিলে অনেক-কিছু শেখা যায়।

তিমিরের নিজেরও মনে হত, কথাটা মিথ্যে নয়।

কিন্তু এক-একদিন সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে মন মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। মনে হত, সমস্ত দিনটা বৃথায় গেল। কত আশা-ভরসা নিয়ে মা-বাবা তাকে এই কলকাতায় পাঠিয়েছেন। যদি সে পাস করতে না পারে?

—আরে দূর, পরীক্ষা কখন তার ঠিক নেই! নে সিগারেট খা…

বলে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল অরুণাভ।

তিমির হাসল।—আমি সিগারেট খাই?

—আমিই কি খেতাম নাকি? নে নে, আর ভাল ছেলে হতে হবে না। অনাথের মত ব্রিলিয়েণ্ট ছেলে সিগারেট ধরল, আর তুই...

কথাটায় কেমন একটা কৌতুক বোধ করল তিমির।—খাব?

সত্যিই একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরল। দেশলাই জ্বেলে ধরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। যতবারই ধরাতে যায়, কাঠিটা নিবে যায়। দেশলাইয়ের বাক্স প্রায় অর্ধেক খালি হয়ে গেল।

এদিকে তিমিরের দুর্দশা দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে অরুণাভ আর অনাথ। ঠাট্টার হাসিতে চায়ের দোকানের সবুজ টেবিলটাও যেন ঝনঝন প্রতিধ্বনি তোলে।

শেষ পর্যন্ত অরুণাভর হাতের সিগারেট থেকেই ধরিয়ে নিল তিমির।

আর অনাথ বলল, সেদিনের কথা মনে আছে?

—কোন্ দিনের? কী কথা? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল তিমির।

অনাথ মনে পড়িয়ে দিল। মনে পড়তেই লজ্জিত বোধ করল তিমির।

প্রথম যেদিন আলাপ হয় অনাথের সঙ্গে, সেদিন ক্লাসের ফাঁকে এক-ঘণ্টার ছুটিটা দুজনে কাটিয়েছিল কলেজের সামনের সবুজ-ঘাসে-ঢাকা মাঠটায় বসে।

দুজনে এসে বসেছিল পাশাপাশি। আর গল্প করতে করতে কখন সিগারেট বের করে ধরিয়েছিল অনাথ।

তিমির বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, আপনি সিগারেট খান?

—হ্যাঁ, খাই তো। উত্তর দিয়েছিল অনাথ।

তিমির তখন অবশ্য আর কিছু বলে নি, কিন্তু অনাথ বেশ

বুঝতে পেরেছিল, তার পর থেকে তিমির যেন তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত।

সেই কথাটাই মনে পড়িয়ে দিল অনাথ। আর অরুণাভ বললে, ওটা একেবারে পাড়াগেঁয়েই রয়ে গেল। আরেক দিন কী করেছিল জানিস?

—কী? অনাথ নতুন কোন কৌতুকের সন্ধান পাবার আশায় চোখ তুলে হাসল।

সে-কথা মনে পড়লেও লজ্জায় মাটিতে মিশে যায় তিমির। যে শোনে সে-ই ঠাট্টা করে।

তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে সে। কলেজের সামনে বাস থেকে নেমেই খেয়াল হল, বাসের ভাড়া দিতে ভুলে গেছে, টিকিট কাটে নি। সঙ্গে সঙ্গে পরের বাসটায় উঠে চলে গিয়েছিল শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত, আগের বাসটাকে খুঁজে বের করে টিকিটের পয়সা দিয়ে ফিরে এসেছিল। পাঁচটা পয়সা দিতে গিয়ে আরও দশটা পয়সা খরচ হয়ে গিয়েছিল।

এখন ভাবলেও হাসি পায়। কিন্তু কেন? একা একা যখন চিন্তা করে তিমির, নিজের ব্যবহারে নিজেই বিস্মিত হয়। লজ্জিত হবার মত ঘটনা তো নয়, তবু লজ্জা পায় কেন? তবে কি ক্রমে ক্রমে বদলে যাচ্ছে তিমির? যা একদিন তার গর্ব ছিল আজ তা লজ্জা?

কিন্তু তিমির কি শহর কলকাতাকে ভালবেসেছে, না রত্নার কলকাতাকে?

রত্নার কথা মনে পড়তেই কেমন একটা বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শ পেল সে। না বেদনা, না তৃপ্তি। অথচ দু-ই যেন মিশে আছে একটি দীর্ঘশ্বাসে। হ্যাঁ, ভালবাসা বুঝি বা দীর্ঘশ্বাসের মতই। সব ব্যথা অভিমান দুঃখ উজাড় করে দেওয়ার তৃপ্তির মত।

একটা মানুষ এত কাছে থেকেও এত দূরে থাকার যে কী অসহ্য যন্ত্রণা! প্রতিদিনই রত্না আসত, হাসত, অনর্গল কথা বলত মালার সঙ্গে—তিমিরের চোখের সামনে, মনের কাছে কাছে। এত ইচ্ছে হত কথা বলতে, তবু মুখ তুলে তাকাতে পারত না তিমির। কী এক দারুণ লজ্জা এসে অবশ করে দিত তাকে, রত্না কাছে এলেই। আর যতক্ষণ কাছে কাছে দৃষ্টির মধ্যে ঘুরে বেড়াত রত্না, ততক্ষণ সমস্ত শরীরে যেন রোমাঞ্চ অনুভব করত।

তার চেয়ে বেশী রোমাঞ্চ, যেদিন রত্না তার টেবিলে, তার ঘরে উপস্থিতির স্মৃতিটুকু রেখে দিয়ে চলে যেত তিমির কলেজ থেকে ফিরে আসার আগেই। কোনদিন হয়তো এসে দেখত টেবিলের ওপর এক রাশ কাগজ কাঁচিতে কেটে কুচিকুচি করে ছড়িয়ে রেখে গেছে রত্না। হ্যাঁ, সব-কিছুর পিছনে যে রত্নার স্পর্শ আছে তা বলে দিতে হত না, আপনা থেকেই বুঝতে পারত। কোনদিন এসে দেখত বইয়ের রাশি উলটাল করে রেখে গেছে, দেরাজের চিঠিগুলো খুলে খুলে পড়েছে যেন। কোনদিন কলেজের নোটের খাতায় পাতা ভরে নাম সই করেছে রত্না। সমস্ত পাতা-জুড়ে রত্নার নাম—বার বার চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎ চমকে উঠল তিমির। হ্যাঁ, সব শেষে এক জায়গায় তিমিরের নাম—রত্নারই লেখা।

কত তুচ্ছ ঘটনা—তবু সমস্ত মন একটা খুশির মৌচাকের মত গুনগুন করে উঠল। আর হৃদয় কাঙাল হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে।

অথচ রত্নার ছোট বোন রানীর সঙ্গে কথা বলতে তো কই এতটুকু লজ্জা হত না! কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছে।

গল্প করতে অবশ্য আসত না রানী। আসত অঙ্কের খাতা নিয়ে।—এই অঙ্কগুলো বুঝতে পারছি না তিমিরদা, বুঝিয়ে দিন না।

খাতাটা খুশিমনেই টেনে নিত তিমির, তারপর জিগ্যেস করত, এত বড় বড় অঙ্ক তোমাদের করতে হয়?

—হইয় তো।

বিস্মিত হত তিমির। তবু অঙ্ক কষে দিতেও আনন্দ। করে দিত প্রত্যেকটি অঙ্ক, বুঝিয়ে দিত। আর রানী বুঝল কি বুঝল না, অঙ্কগুলো হয়ে গেলেই খাতাটা নিয়ে ছুটে পালাত।

কিন্তু এর পিছনে যে এতখানি ষড়যন্ত্র আছে কোনদিন কল্পনাও করে নি তিমির।

সেদিন নীচের ঘরে মাস্টারমশাইয়ের সামনে বসে কলেজের গল্প করছে সে, মালা পড়ছে একমনে, এমন সময় রত্না এসে হাজির হল বইখাতা নিয়ে।

প্রতিদিন সকালে এই সময়টায় আসত রত্না। ঘণ্টাখানেকের জন্যে। আর মাস্টারমশাই এই এক ঘণ্টা পড়ানোর জন্যে কয়েকটা টাকা পেতেন মাসে মাসে। আর এমন আশ্চর্য, রত্না পড়তে এলেই মাস্টারমশাইকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিপর্যস্ত করে তুলত মালা।

রত্না আসতেই মাস্টারমশাই বললেন, অঙ্কের হোমটাস্ক করে নিয়ে যাচ্ছ তো আজকাল?

রত্না ঘাড় নাড়লে।

—ঠিক হচ্ছে, না সব ভুল?

রত্না হেসে বললে, রোজ ফুল মার্ক পাই। ভুল হবে কেন?

মাস্টারমশাই তাঁর কাঁচাপাকা ভুরুর নীচের একজোড়া চোখ তুলে তাকালেন সবিস্ময়ে।

—ফুল মার্ক পাও? কই, দেখি খাতা?

খাতা বের করে দেখতে দিল রত্না, আর তার ওপর চোখ

বুলোতে না বুলোতে মালা তার ইংরেজি বইটা খাতার ওপর তুলে ধরলো।—এটা বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দিন না মাস্টারমশাই।

—দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা কর···

নাকী সুরে আবদার ধরল মালা, না মাস্টারমশাই, আগে এইটে বুঝিয়ে দিন···

মাস্টারমশাই মালার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর রত্নার খাতাটা তিমিরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ তো তিমির, দিদিমণিরাও বোধহয় অঙ্ক জানে না। ফুল মার্ক পেয়েছে? রত্না ফুল মার্ক পেয়েছে?

তিমির খাতাটা তুলে নেবার আগেই ছোঁ মেরে কেড়ে নিল রত্না। বললে, না, দেখতে হয় আপনি দেখুন, তিমিরদা কেন দেখবে, ও কি মাস্টার নাকি?

মাস্টারমশাই খাতাটা টেনে নিয়ে বললেন, চুপ করে বসে থাক তুমি। দেখ তো তিমির···

ধমক খেয়ে চোখ ছলছল করে উঠল রত্নার। মুখ নীচু করে বসে রইল সে।

আর খাতার ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে বিস্মিত না হয়ে পারল না তিমির। এ কী! এ সব অঙ্ক তো সে রানীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, করে দিয়েছিল নিজের হাতে। খাতা থেকে মাথা তুলতেই তিমির দেখলে, করুণ মিনতিভরা দুচোখ মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রত্না। চোখোচোখি হতেই হাত নেড়ে ইশারা করলে সে। অর্থাৎ মাস্টারমশাইকে বলবেন না।

পরের দিন রানী আবার আসতেই তিমির বললে, যার হোমটাস্ক তাকে আসতে বল।

কলেজে এলেই সব ভুলে যেত তিমির। নোংরা বাড়িটা, মামীমার চিৎকার, এমন কি রত্নাকেও আর মনে থাকত না। রত্নার চেয়েও বেশী আকর্ষণ কলেজের বন্ধুদের।

সেদিন একটু সকাল সকালই কলেজে চলে এল তিমির। ভোরবেলায় উঠেই ছোটমামার ডাক শুনে ছুটে গিয়েছিল ও।

টাটকা খবরের কাগজটা মেলে ধরে তখনও থরথর করে কাঁপছে ছোটমামা। যুদ্ধ লাগার খবর শুনেও এতখানি বিচলিত হতে কেউ দেখে নি তাঁকে। মাসের পর মাস একটা না একটা জাহাজডুবির খবর এসেছে, তবু বিচলিত হন নি ছোটমামা।

মালা ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলে, কী হয়েছে বাবা?

—কী হয়েছে! এই ছাখ। বলে কাগজটা মেলে ধরলেন।

কাগজটার ওপর তিমির আর মালা হুমড়ি খেয়ে পড়তেই বললেন, সুভাষ বোসকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—পাওয়া যাচ্ছে না?

—হ্যাঁ, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সত্যিই তো। বড় বড় হরফে প্রায় সারা পাতা জুড়ে ওই একটাই খবর। নিজের বাড়িতেই ছিলেন বটে, কিন্তু ইংরেজের সবচেয়ে বড় শত্রু তিনি, চব্বিশ ঘণ্টাই তো গোয়েন্দাদের চোখ ছিল তাঁর ওপর, তাঁর বাড়ির ওপর। কে কখন আসছে, কে বের হচ্ছে সবই তো লক্ষ্য করেছে তারা। তা হলে পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কী করে বেরিয়ে গেলেন তিনি? কেন গেলেন? কোথায়?

২৬শে জানুয়ারি তো তখন ছুটি ছিল না।

কলেজে এসে তিমির দেখলে সবাই আজ একটু তাড়াতাড়ি এসেছে। সকলেই কিছুটা উদ্বিগ্ন, কিছুটা বা উল্লসিত।

মুখে মুখে তখন একটাই কথা। কী ভাবে গেলেন তিনি, কোন্ পথে, কোথায়, কেন?

সব ক-খানা কাগজই হাতে হাতে ঘুরছে। যদি কোনও কাগজ একটা লাইন বেশী খবর দিয়ে থাকে! ঘর বন্ধ করে পুজোআর্চা করছিলেন নাকি কয়েকদিন ধরে! বাড়ির লোক এক ফাঁক দিয়ে খাবার দিয়ে যেত, সেদিন সকালে খাবার দিতে এসে দেখলে, নেই তিনি।

এও কি সম্ভব? বাড়ির লোক জানত না কিছু?

নানা গুজব, নানা রটনা তখন মুখে মুখে। কিন্তু সব-কিছুর পিছনে যেন ভক্তের বাহবা লুকিয়ে রয়েছে। সব-কিছুর পিছনে অজ্ঞাত অবোধ্য এক ভরসা।

সারাটা দিন এই এক কথা। তবু যেন কথা শেষ হয় না। বিকেলে অরুণাভর সঙ্গে তাদের বাড়িতে এল তিমির আর অনাথ।

এসেই দেখলে, বাইরের বসবার ঘরে ব্রজবাবু বসে আছেন আর অরুণাভর বোন মীরা বাপের পিছনে নীল-ডাউন হয়ে পাকা চুল তুলে দিচ্ছে।

ব্রজবাবু ওদের দেখতে পেয়েই ডাকলেন, এস তিমির, এখানে এস। বলে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

তারপর প্রশ্ন করলেন, এ ছেলেটি কে বাবা? একে তো দেখি-নি আগে।

অনাথের পরিচয় দিল অরুণাভ।—খুব ভাল ছেলে, স্কলারশিপ পেয়েছে।

—তাই নাকি? বেশ বেশ। তা খবর কী বল?

তিমির হেসে বললে, খবর তো আজ একটাই জ্যাঠামশাই। পুলিস-ব্যাটাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সুভাষ বোস কেমন···

ব্রজবাবুর মুখের চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেল। ঠোঁটের ওপর তর্জনী তুলে মুখে চাবি দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ওসব আলোচনা করো না। কাগজে যা বেরোয় শুধু পড়ে যাও, আলোচনার দরকার কী?···যাও টুনু, বন্ধুদের তোমার ঘরে নিয়ে যাও।

সত্যিই তো, আলোচনার দরকার কী?

অরুণাভ ওদের দুজনকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বেরিয়ে যেতেই অনাথ বললে, দেখেছিস, আজকের দিনেও পুলিসের ভয় গেল না এদের।

তিমির হেসে বললে, গভর্নমেন্টের কন্ট্রাক্টরি করে যে, যদি কন্ট্রাক্ট চলে যায় সেই ভয়!

অরুণাভ ফিরে আসতেই চুপ করে গেল দুজনেই।

কিন্তু কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায়। এত বড় একটা ঘটনা, এত বড় একটা রহস্য—সারা দেশ তোলপাড় হচ্ছে, আর তারা কিনা চুপ করে থাকবে!

সকলের মনের মধ্যেই একটা ভয়ও যে না ছিল তা নয়। একবার তো সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি, কলেজে পড়বার সময়। তেমনি কোন আধ্যাত্মিকতার টানেই কি শেষ পর্যন্ত ঘর ছাড়লেন? কিন্তু এত বড় পরাজয়কে কেউই যেন মেনে নিতে রাজী নয়।

না মেনেই বা উপায় কী! বাড়ির লোক বলছে, একা একা ঘরের দরজা বন্ধ করে নাকি গীতা পড়তেন, পুজোআর্চা করতেন। বিচার চলছিল তখন, জামিনে মুক্ত হয়ে হঠাৎ সন্ন্যাসের আহ্বানেই কি চলে গেলেন কোন দুর্গম গিরিগুহায়? কোন আশ্রমে?

কয়েকটা দিন যুদ্ধের খবরের চেয়েও বড় হরফে বের হল

তাঁর অন্তর্ধানের কাহিনী। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলল। পণ্ডিচেরী, কাশী, বেলুড়—বিভিন্ন আশ্রমে। না, কোথাও নেই। কোনও খবরই নেই।

ওদিকে মৌলানা আজাদ জেলে গেছেন। রাষ্ট্রপতি আজাদ। গান্ধীজীও হয়তো যাবেন। ধরতে সাহস পাচ্ছে না হয়তো সরকার।

সকলের রক্তই যেন ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে উঠছে। জার্মানী একটার পর একটা দেশে এগিয়ে চলেছে। গ্রীসে পোঁছে গেছে, এদিকে জাপান আর আমেরিকাও যেন তৈরি হচ্ছে যুদ্ধে নামবার জন্যে।

এই সুযোগ। এখনই শুরু করা উচিত স্বাধীনতার যুদ্ধ। আর এই সময়েই কিনা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন সুভাষচন্দ্র? রবীন্দ্রনাথও যাঁর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন?

স্বাধীনতার যুদ্ধ! ও শুধু মুখের কথা, কাগজের ভাষা। কয়েকটা দিন যেতে না যেতে আবার সকলে মিইয়ে গেল।

প্রতিদিনের মত ম্যাপ খুলে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বোঝাতে যাচ্ছিল অনাথ। ইতিহাসের ক্লাসে শেষ বেঞ্চিতে বসে।

অরুণাভ হেসে বললে, রেখে দে তোর যুদ্ধের খবর। বলধার মামলাটা পড়ছিস?

তিন জনেই হেসে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মশগুল হয়ে উঠল একটা কেচ্ছা-কাহিনীকে ঘিরে।

আর অরুণাভ কি একটা অশ্লীল রসিকতা করতেই সশব্দে হেসে উঠল ওরা। সামনের বেঞ্চির নিরীহ-গোছের ছেলে প্রবীরের কানে গিয়েছিল কথাটা। সেও হেসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে দৃষ্টি গেল প্রফেসরের।

তর্জনীর ইশারায় তাকে দাঁড়াতে বললেন প্রফেসর।

উঠে দাঁড়াল প্রবীর।

প্রফেসর রোল নম্বর জিগ্যেস করলেন।

জানাল প্রবীর।

—কেন হাসছিলে ?

উত্তর নেই প্রবীরের মুখে।

—কেন হাসছিলে ? রূঢ় হয়ে উঠল প্রফেসরের কণ্ঠস্বর।

—নিরীহ-গোছের ছেলে প্রবীরের মধ্যে যেন হঠাৎ একটা অন্য মানুষ ঢুকেছে। ক্রোধে ক্ষোভে ফরসা গোলগাল মুখখানা তার লাল হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে।

ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে সে বললে, কানের কাছে হাসির কথা বললে না হেসে থাকা যায় না বলে।

এমন উদ্ধত উত্তর আশা করেন নি প্রফেসর। ক্রোধে অপমানে থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছেন তখন।

তবু শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন, কে বলেছে হাসির কথাটা ? কি বলেছে ?

চুপ করে রইল প্রবীর।

—কে বলেছে ? কী বলেছে ? আবার প্রশ্ন করলেন তিনি।

প্রবীর নিরুত্তর।

উষ্মা কণ্ঠে প্রফেসর বলে উঠলেন, কে বলেছে বল, না বললে আমি তোমাকে কলেজ ছেড়ে যেতে বাধ্য করব।

প্রবীর উত্তর দিল, আপনার যা খুশি করতে পারেন। কে বলেছে আমি জানি না।

একটা বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তখন সারা ক্লাস। নিঃশব্দে বসে আছে প্রত্যেক ছাত্র। শুধু দেখছে, শুনছে, কিন্তু তাদের যেন কিছুই করবার নেই।

অরুণাভ ? কিছুই জানে না যেন এমনি মুখের ভাব করে বসে আছে সে, তিমির তার দিকে তাকিয়ে দেখল। অরুণাভই

তো বলেছিল কথাটা। সে কেন উঠে বলছে না? কেন এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা করছে না প্রবীরকে?

ভাল ছেলে হিসেবে নাম আছে প্রবীরের। তার চেয়েও বড় তার পিতৃপরিচয়। এই কলেজেরই উচ্চতম কর্ণধারের একমাত্র পুত্র সে। এই তুচ্ছ কারণে কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হলে শুধু তার নামেই কলঙ্ক পড়বে না, তার পিতৃনামেও কলঙ্ক পড়বে।

এ অবস্থা থেকে যে-কোন উপায়ে প্রবীরকে রক্ষা করতে হবে, ভাবল তিমির। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি বলেছি স্যার। আমি তার জন্যে লজ্জিত।

তিমিরের মুখের দিকে তাকালেন প্রফেসর, বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ, বসো।—কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়ব না। বলে প্রবীরের দিকে তাকালেন। বললেন, তুমি আমার ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও, পরে দেখব কী করতে পারি।

প্রবীর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

আবার পড়াতে শুরু করলেন প্রফেসর। আর অরুণাভ ফিসফিস করে বললে, কী রে তিমির, তুই কেন বাগড়া দিতে গেলি?

তিমির কোনও উত্তর দিল না।

অরুণাভ হেসে বলল, আরে, এ ব্যাটা টেম্পোরারী, প্রবীরকে চেনে না, জানে না তো কার ছেলে! ভাল করে নারদ নারদ লাগত তো জমত ভাল। শেষ পর্যন্ত দেখতিস এ ব্যাটাকেই কলেজ ছাড়তে হত, প্রবীরের কিছুই হত না।

কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল বলেছিল অরুণাভ।

দুদিন পরেই ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে চলে যেতে হল প্রবীরকে। কলেজে ডিসিপ্লিন রক্ষার ব্যাপারে প্রিন্সিপ্যাল এতটুকু দুর্বলতা দেখালেন না। তার জন্যে চাকরি ছেড়ে দিতে হয় সেও ভালো।

এত সব ছোট ছোট ঘটনা কেন মনে পড়ছে তিমিরের? আজকের দিনে এ ঘটনাগুলো দেখা যায় না বলেই কি?

সেদিন যেগুলো ছিল স্বাভাবিক, আজ সেগুলোই ব্যতিক্রম। গর্ব করে কাগজের প্রথম পাতায় ছাপবার মত। কত বদলে গেছে এই পৃথিবীটা! ন্যায়, নীতি, সমাজ। দায়িত্বকে মানুষ তখন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত না।

কলেজ থেকে ফিরে আসতেই একদিন তিমিরকে ডাকলেন ছোটমামা।

তিমির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, একটা দুঃসংবাদ আছে তিমির।

দুঃসংবাদ! হঠাৎ বুকের ভেতর একটা ধাক্কা খেল তিমির। এই তো বড়দিনের ছুটিতে দেশ থেকে ঘুরে এসেছে সে। বাবা মা ভাই বোন সকলকেই দেখে এসেছে। এর মধ্যে…

দুঃসংবাদটা কী, শোনবার ধৈর্য রইল না। জিগ্যেস করলে, বাবা মা ভাল আছে, চিঠি এসেছে কোন?

ছোটমামা হেসে ফেললেন। বললেন, না না, সে দুঃসংবাদ নয়। মানে, আমি বদলি হয়ে যাচ্ছি।

—বদলি?

ছোটমামা বিমর্ষমুখে বললেন, হ্যাঁ তিমির। আমাদের কানপুর আপিসে যেতে হবে আমাকে।

—আমি? আমি কী করব? হতাশার সুর ফুটল তিমিরের গলায়।

ছোটমামা হেসে বললেন, পড়বে, আবার কী করবে।

—কিন্তু…

সমস্যাটা বুঝলেন তিনি। হেসে বললেন, কানপুরে গেলে আমার মাইনে বাড়বে অনেক, বুঝলে না। তাই না গিয়ে পারছি না। তোমার পড়ার খরচ আমিই পাঠিয়ে দেব মাসে মাসে, কিন্তু থাকবার তো একটা জায়গা চাই, একটা মেস দেখে নাও।

—আচ্ছা। বলে তিমির চলে এল সেখান থেকে।

আর চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বুক ভরে একটা ব্যথা যেন গুমরে উঠল। কিসের ব্যথা? মায়া, মমতা, স্নেহপ্রীতির বন্ধন? না, শুধু পরিচিত পরিবেশকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ? ছোটমামা, মামীমা, মালা—এদের চেয়েও যেন অনেক বেশী টান এই সিঁড়িটার, ঘরগুলোর, বইয়ে সাজানো টেবিলটার, এই গলি-রাস্তাটার।

এই সিঁড়ি দিয়ে কতবার উঠেছে নেমেছে, এই ঘরগুলোয় কতদিন অকারণে ঘুরেছে, এই পড়ার টেবিল আর সরু গলিটা কতদিন যেন ছোট্ট শিশুর মত তার সঙ্গে খেলা করেছে। এ-সব ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবতেও কেমন যেন লাগে।

আর সবচেয়ে বড় কথা, রত্নার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে।

ছোটমামাই কাছাকাছি একটা মেস ঠিক করে দিলেন। নিজে গুছিয়ে দিলেন তার বাক্স বিছানা। রিক্শা ডেকে দিলেন।

আর যাবার সময় পিছন ফিরে তিমির দেখল, মালার গলা জড়িয়ে ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রত্না। দুটি চোখের ভাষায় কী যেন এক না-বলা কথা লুকিয়ে আছে। কী যেন বলতে চেয়েও বলতে পারে নি।

তারপরও মাঝে মাঝে এসেছে তিমির। কিন্তু রত্নাকে দেখতে

পায় নি কোনদিন। চতুর্দিকে তাকিয়ে খুঁজেছে তাকে। এক-একদিন মনে হয়েছে মালাকে জিগ্যেস করবে তার কথা, কিন্তু পারে নি।

আর যেদিন একটা লরিতে জিনিসপত্র তুলে ট্যাক্সি ডেকে ছোটমামাদের স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেছে, সেদিনও রত্নাকে দেখতে পায় নি।

তারপর অনেকগুলো মাস কেটে গেছে।

এদিকে কলেজের পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে ক্রমশ। পড়ার চাপে, পলিটিক্স ক্রিকেট সিনেমার নেশায় কেমন করে যেন রত্নাকে ভুলেই গিয়েছিল সে।

হয়তো একেবারেই ভুলে যেত, যদি না এমন আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যেত আবার।

কলেজ থেকে ফিরছিল তিমির।

সামনে রিক্‌শার ভিড়ে ট্রামটা চলছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আর ট্রামের জানলায় চোখ রেখে বসেছিল ও। হঠাৎ চমকে উঠল মেয়েটির দিকে চোখ পড়তেই।

সাদাসিধে একখানা ছাপা শাড়ি পরে বুকের ওপর দুহাতে একরাশ বই আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় কোন বান্ধবীর অপেক্ষায়। মেয়েদের কলেজটার তখন ছুটি হয়েছে। নানা রঙের একঝাঁক রঙিন পাখির মত বেরিয়ে আসছে তারা, সারা অঞ্চলটায় যেন মন-খুশি-করা একটা বাতাস বইয়ে দিয়েছে। আর সেই ভিড় থেকে একটু তফাত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি।

চোখ পড়তেই চমকে উঠল তিমির। রত্না না?

হ্যাঁ। রত্নাই।

কিন্তু অনেকখানি পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যেন শরীরে। সেই কিশোরী-চঞ্চল মুখে নেমেছে স্থির স্নিগ্ধতা, শরীরে যৌবনের সুস্পষ্ট রেখা।

চোখে চোখ পড়তেই চিৎকার করে ডাকল রত্না।—তিমিরদা!

তাড়াতাড়ি নেমে এল তিমির, হাতের পাতলা খাতাখানা দোলাতে দোলাতে।

কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে, এখানে?

—বাঃ রে, এই তো আমাদের কলেজ।

—কলেজ? বিস্মিত না হয়ে পারে নি তিমির। তারপর মনে পড়েছিল মাঝখানে অনেকগুলো মাস কেটে গেছে। পরীক্ষা পাস করে কলেজে ঢুকেছে রত্না।

রত্না হেসে বললে, আমি বুঝি তেমনি ছোট আছি এখন?

কী যেন বলতে যাচ্ছিল তিমির, তার আগেই দূর থেকে একটি মেয়ে ডাকল রত্নাকে।

রত্না ফিরে তাকাতেই মেয়েটি হাসল ঠোঁট টিপে, অর্থাৎ বুঝেছি। রত্না লজ্জিত হল তার হাসি দেখে বললে, ফাজিল!

মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, আমি চললাম।

রত্না ঘাড় নাড়ল। তারপর বললে, চল না তিমিরদা, হাঁটতে হাঁটতে যাই, ট্রাম যে কখন আসবে!

ইচ্ছে করেই যেন পথটাকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে চলল রত্না। এক গলি থেকে আর-এক গলি। এ-কথা সে-কথা। কেমন আছে তিমির, ফাইনাল পরীক্ষা কখন, কোথায় থাকে সে, মালারা চিঠি দেয়? আরও কত কী! কত সাধারণ কথা, নিরর্থক কথা। তবু তারই মধ্যে কী এক অপূর্ব রোমাঞ্চ!

একই রাস্তায় একবার ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত আবার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি যাওয়া-আসা করতে করতে তিমির হঠাৎ লক্ষ্য করল কয়েকটা ছেলে ওদের উদ্দেশে টিপ্পনী কাটছে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মধ্যবয়সী বউটার হাসিও বোধহয় ওদের উদ্দেশেই।

তিমির বললে, চল এখান থেকে।

—কোথায় যাওয়া যায়! চিন্তিত দেখাল রত্নাকে। অর্থাৎ এত শীগগির যেতে চায় না সে।

নিজেই উপায় বাতলে দিল রত্না।—চল, একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসা যাক।

তাই চল।

বড় রাস্তার ওপরে নির্জন একটা চায়ের দোকানের কেবিনে গিয়ে বসল তুজনে, পর্দা টেনে দিয়ে।

তুকাপ চা দিয়ে গেল বয়।

শুধু তুকাপ চা সামনে রেখে অনর্গল কথা বলে গেল রত্না। অর্থহীন, আজেবাজে, খাপছাড়া—কথা আর কথা।

তারপর একসময় চুপ করল।

তুজনেই চুপ করে বসে রইল। কোন কথা নয়। শুধু নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকা। শুধু নিঃশব্দতার মধ্যে একাত্ম হওয়া।

আনমনে খুচরো কয়েকটি চুল বাঁ হাতের আঙুলে পাকাতে পাকাতে তিমিরের খাতাখানার পাতা উল্টে যায় রত্না। আর রত্নার একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে তিমির।

ছোট্ট এই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে তুটি প্রাণ যেন গোপনে ফুলঝুরি হয়ে ফুটে চলেছে। এই শান্ত নিঃশব্দতায় যেন তুটি হৃদয় ঝরনার তরঙ্গে মুখর হয়ে উঠেছে।

বিকেলের তপ্ত রৌদ্র ম্লান হয়ে এল। নির্জন চায়ের দোকানে লোক ঢুকছে একে একে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রত্না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল।

—চল।

উঠে দাঁড়াল তুজনেই। একই সঙ্গে তুজনেরই চোখ পড়ল

চায়ের পেয়ালা দুটোর ওপর। দু-চার চুমুকের পর পেয়ালা দুটোর কথা দুজনেই বুঝি ভুলে গিয়েছিল।

নিজেরই অজান্তে পেয়ালায় হাত ছোঁয়াল তিমির। ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে চা।

পরস্পর চোখোচোখি করে হেসে উঠল কৌতুকে। থাক্, ওই দু-পেয়ালা ঠাণ্ডা চা পড়ে থাক্ ওদের এই মিষ্টি বিকেলটুকুর স্মৃতি নি

বাইরে বেরিয়ে এসে ট্রামের জন্যে দাঁড়াল দুজনে।

রত্নার ট্রাম এল।

আর বিদায়ের মুহূর্তে আলতো করে তিমিরের হাতখানা স্পর্শ করল রত্না। এই এতখানি সময়ে এত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ কথালাপের মধ্যে এই একটি অসতর্ক স্পর্শ।

ট্রামের পা-দানিতে উঠতে উঠতে আলতো ভাবে তিমিরকে স্পর্শ করে রত্না বললে, কাল ঠিক এই সময়ে।

ঘাড় নেড়ে সায় দিল তিমির। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ছুটন্ত ট্রামের দিকে।

এ এক অদ্ভুত অনুভূতি! কোন কথা না বলেও সব-কিছু উজাড় করে দেওয়ার অনুভূতি।

সে এক অসহ্য রাত, নিদ্রাহীন রাত। ফাঁসির আসামীকেও হয়তো এভাবে তিল তিল করে সময় পার করতে হয় না।

নোংরা মেসের ক্লেদাক্ত পরিবেশটাও হঠাৎ যেন রমণীয় হয়ে উঠেছিল তিমিরের কাছে। ভাঙা দরজাটা পার হয়ে এসে বাঁ দিকে দু-তিনখানা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর, পাশেই রান্নাঘর, কয়লার ধোঁয়া, ঠাকুর আর ঝিয়ের চিৎকার। শ্যাওলা-পড়া কলতলা পার হয়ে ডান দিকেই সিঁড়ি। মানুষের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই কয়েকখানা ঘর। তার একটাতে উঠে এসেছিল তিমির, মালারা বদলি হয়ে চলে যেতেই।

এই আলোবাতাসহীন ছোট ঘরখানায় ফিরে এলেই তিমিরের আশা-আনন্দে-ভরা মনটা চুপসে ছোট হয়ে যেত। হাঁপিয়ে উঠত পরিত্রাণ পাবার জন্যে।

কোন কোনদিন চলে যেত কাছের পার্কটায়। অনেক রাত অবধি সেখানে কাটিয়ে ফিরে আসত নিজের তক্তপোশে।

কিন্তু সেদিন এই ঘর, স্যাঁতসেঁতে উঠোন, ভাঙা সিঁড়ি, মলিন বিছানা কোন কিছুই বিরক্তিকর মনে হল না।

বার বার শুধু বিকেলের রোমাঞ্চময় একটি ঘণ্টাকে রোমন্থন করল। বার বার গুনগুন করল রত্নার নাম।

রত্না, রত্না, রত্না!

সত্যি, এই ক-টা মাসের মধ্যে রত্নার শরীরে যে এমন পরিবর্তন ঘটে গেছে, এমন উচ্ছল যৌবনের প্লাবন নেমেছে তার দেহে-মনে, তা বুঝি কল্পনাও করতে পারে নি তিমির।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিকেলের দৃশ্যটুকু বারবার উপভোগ করেও কী এক বিচিত্র আনন্দ! বিদায়ের মুহূর্তে তিমিরের হাতের ওপর হাত নেমে এসেছিল রত্নার। চোখে মিনতির ভাষা, আর সেই ছোট্ট এক টুকরো কথা।—কাল ঠিক এই সময়ে।

কিন্তু সেই 'কাল' বুঝি অনেক দূরে, অনেক দেরিতে আসবে সেই নির্দিষ্ট সময়।

প্রতিটি মিনিট যেন এক-একটি ঘণ্টার মত ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে।

মেসের ঠাকুর একসময় এসে ডাক দিল, দশটা বেজে গেছে, খাবেন না বাবু।

নীচের সেই স্যাঁতসেঁতে ঘরের সারি সারি পিঁড়ির একপাতে

এসে. বসল তিমির, আশেপাশের বোর্ডাররা কে কী বলছে, কিসের আলোচনা চলছে, কোনদিকেই তার কান গেল না। অন্যদিন হয়তো তিমির নিজেই কোন না কোন তর্কের অবতারণা করত, আলোচনায় যোগ দিত।

কে একজন বুঝি লক্ষ্য করল, তিমিরের কোন সাড়া-শব্দ নেই, একমনে খেয়ে চলেছে। কিংবা খাওয়ার মন নেই, শুধুই ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

—কী তিমিরবাবু, চুপচাপ কেন, শরীর খারাপ নাকি?

তিমির সচকিত হাসি হেসে বললে, না, এমনি।

অন্য কে একজন টিপ্পনী কাটলে, পরীক্ষার ভাবনা ঢুকেছে, ফাইনাল পরীক্ষা যে দুদিন পরেই।

চমকে উঠল তিমির। সত্যিই তো। এ কী করছে সে! প্রতিদিন কলেজ থেকে ফিরে এসেই পড়তে বসে। অরুণাভর সঙ্গে কলেজের পরে আড্ডা দিতে যায় না পরীক্ষার ভয়ে। অথচ আজ সমস্ত সন্ধ্যাটা নষ্ট করল সে রত্নার কথা ভেবে ভেবে?

গ্রামের ছেলে সে, কত আশা ভরসা নিয়ে কলকাতায় তাকে পাঠিয়েছেন বাবা, কত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায়!

না, রত্নার চিন্তা মন থেকে দূর করতে হবে।

আর-একটু পরেই আলো নিবে যাবে মেসের। রঙ-চটা ট্রাঙ্কটা খুলে মোমবাতি বের করল তিমির। তারপর বই খুলে পড়তে শুরু করল। হাতের কাছে থাক্ মোমবাতিটা, আলো নিবে গেলেই জ্বালানো যাবে.

কিন্তু না, শত চেষ্টা করেও মনের একাগ্রতা আনতে পারছে না তিমির। চোখের দৃষ্টিটা বইয়ের পাতার ওপর যেন ভেসে আছে। স্থির হতে পারছে না। কেবলই রত্নার সুন্দর মুখখানা উঁকি দিচ্ছে মনের কোণে।

এই দিনটির জন্যে, এমনি এক অন্তরঙ্গতার শান্ত ছবির কল্পনা বুঝি কোনদিনই তিমিরের মনে উঁকি দেয় নি। নারীদেহের এই উন্মাদনা কোনদিনই হয়তো বা ধরা দেয় নি তার চোখে।

স্বপ্নের ঘোরেই সমস্ত রাত কেটে গেল যেন। যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা হয়ে গেছে অনেক। আর ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে রত্নাকে মনে পড়ল। মনে পড়ল গত দিনের একটি মধুর অপরাহ্নের কথা।

ঘরের সামনেই এক ফালি সরু বারান্দা, জং-ধরা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা। তারই পাশে এক বালতি জল রেখে গেছে মেসের ঝি। জায়গাটা ইতিমধ্যেই নোংরা হয়ে উঠেছে। মুখ ধুতে ধুতে বিশ্রী আওয়াজ করছে একজন, লুঙ্গি পরে নিমের কাঠিতে দাঁত মাজতে মাজতে পায়চারি করছে আর-একজন। ওদিকের ঘরে হার-মোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরেছে কে একজন। নীচের উঠোনে এক রাশ ছাই, মাছের আঁশ, গত রাতের উচ্ছিষ্ট ভাত। একটা ঘেয়ো কুকুর পরম আনন্দে মুখ ডুবিয়ে আছে তার মধ্যে।

হঠাৎ যেন নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল তিমির। গ্লানি অনুভব করল। এই ক্লেদাক্ত পরিবেশে বাস করে সে কিনা অনুরাগের হাত বাড়িয়েছে রত্নার মত মেয়ের দিকে!

মনে মনে কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করল তিমির।

আজ আবার দেখা হবে রত্নার সঙ্গে। তেমনি ছিমছাম বেশ-বাসে যৌবনের ছন্দ নাচিয়ে আসবে রত্না। যার প্রতিটি কথায় মাধুর্যের প্রলেপ, যার হাসিতে রূপের বিকাশ।

কিন্তু গত দিনের মতই চায়ের দোকানে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ যদি রত্না একসময় জিগ্যেস করে বসে তার ঠিকানা? কোথায় থাকে, কী ভাবে থাকে, যদি দেখতে চায়? যদি বলে বসে, চল তোমার মেসে? কী বলবে তিমির?

না, আনবে না তাকে এখানে। এড়িয়ে যাবে যেমন করে হোক।

কিন্তু কতদিন আর এড়িয়ে এড়িয়ে চলবে? তিন টাকা ভাড়ার এই ঘর ছেড়ে কী করে উঠে যাবে সে ভাল মেসে?

ছোটমামা পনেরটি টাকা পাঠান প্রতি মাসে, বাবার কাছ থেকে কোন মাসে সাত টাকা, কোন মাসে দশ টাকা। তিন টাকা যায় ভাড়া বাবদ, খাওয়ার খরচ ন-টাকা, কলেজের মাইনে আট টাকা, বাকী তিন টাকায় চলে চা-জলখাবার, ধোপার খরচ। আর চা-জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে কোন-কোনদিন সিগারেটের খরচ মেটায় তিমির।

হঠাৎ তিমিরের মনে হল, তার পক্ষে প্রেমের স্বপ্ন দেখা অন্যায়। না, রত্না যাই মনে করুক, তার সঙ্গে আর দেখা করবে না সে।

প্রেম তার জন্যে নয়, অরুণাভদের জন্যে।

কলেজে এসে প্রথমটা অরুণাভকে কিছুই বলল না তিমির। ভাবল, কী হবে অরুণাভকে বলে? আর যখন দেখাই করবে না রত্নার সঙ্গে, তখন এ কাহিনী চাপা পড়ে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু পারল না। একসময় বলে ফেলল গত দিনের কথা, রত্নার সঙ্গে আকস্মিক দেখা হওয়ার কথা, চায়ের দোকানে দু-পেয়ালা চা নিয়ে নিশ্চুপ মুখোমুখি বসে থাকার কথা।

সব শুনল অরুণাভ, তারপর তিমির যখন বলল, রত্না আজ আবার দেখা করতে বলেছে, তখন হঠাৎ তিমিরকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মত অরুণাভ চিৎকার করে উঠল, ব্রেভো!

লজ্জা পেয়ে কোন রকমে অরুণাভর দুহাতের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিমির বললে, না যাব না। এইখানেই ইতি।

—কেন ?

—এমনি। কী হবে ও-পথে পা বাড়িয়ে? হাল্কা সুরে উত্তর দিল তিমির। প্রকৃত কারণটা বলতে বাধল।

অরুণাভ হেসে বলল, অসম্ভব। এ পথে একবার যে পা বাড়িয়েছে তার আর ফিরে আসার উপায় নেই রে তিমির।

কথাটা যে কতখানি সত্যি, তা তিমিরও টের পেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

তিনটে বাজতে না বাজতেই কেমন যেন অধৈর্য হয়ে উঠল তিমির। আর মাত্র এক ঘণ্টা। চঞ্চল হয়ে উঠল ও। মনে মনে ভাবল, মন স্থির করবার চেষ্টা করল। কী করবে ও? যাবে, অপেক্ষা করবে রত্নার পথ চেয়ে, না চুপ করে বসে থাকবে ক্লাসের ভিড়ে, শেষ বেঞ্চিতে ?

ক্ষণে ক্ষণে ঘড়ির দিকে তাকায় তিমির। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে। হৃৎস্পন্দনের চেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা।

হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল তিমির। না, রত্নার আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারবে না ও। যৌবনের প্রথম রোমাঞ্চকে এ-ভাবে বিফল হতে দেবে না।

আর মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে।

অধ্যাপকের কণ্ঠনালী ফুলে উঠেছে নীরস একঘেয়ে বক্তৃতায়। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে অরুণাভ, অনাথ—অন্য সকলেই।

যতক্ষণ মনস্থির করতে পারে নি তিমির, ততক্ষণ মনে হয়েছে দ্রুত পার হয়ে চলেছে প্রতিটি মিনিট। কিন্তু এখন বড় ধীর পায়ে সময় এগিয়ে চলেছে, যেন সময়ের কাঁটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে বাতগ্রস্ত বৃদ্ধের মত।

না, অধ্যাপকের বক্তৃতা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে

না। তা হলে হয়তো নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। হয়ত অপেক্ষা করে করে চলে যাবে রত্না।

এক ঝোঁকে হঠাৎ সুড়ুৎ করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়ল তিমির। তারপর রুদ্ধশ্বাসে এসে ট্রাম ধরল।

এসে নামল রত্নাদের কলেজের সামনে।

না, তখনও ছুটি হয় নি, এক ঝাঁক রঙিন পাখির মত নানা রঙের শাড়ির ঝলমলানি নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে নি তন্বী তরুণীর দল।

লাইটপোস্টটার নীচে দাঁড়িয়ে রইল তিমির। পায়চারি করল অধৈর্য পদক্ষেপে। বার বার তাকাল কলেজের সিঁড়িটার দিকে।

কী আশ্চর্য! একটু আগেই ঘড়ির কাঁটা যেন ছুটে চলছিল। মনে হচ্ছিল যেন মনস্থির করবার সময় নেই হাতে। আর এখন একটি মিনিট যেন একটি ঘণ্টা!

রত্নার ওপর ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠল তিমির।

তার মতই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ছুটি হওয়ার একটু আগে কি চলে আসতে পারে না সে? জানে না, তিমির তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে?

অসহিষ্ণুভাবে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ এক সময় কলেজের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল তিমির। উদ্‌গ্রীব প্রতিক্ষায় তাকিয়ে রইল অদূরের সিঁড়ির দিকে।

হ্যাঁ, এইবার শোনা যাচ্ছে ভিড়ের গুঞ্জন। একটি দুটি করে সুবেশ তরুণী নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

তিমির যেন নিতান্তই ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে এমন একটা মুখভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাকাল ফিরে ফিরে।

তারপর এক সময় মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল রত্নাকে দেখতে পেয়ে। রত্না কি তাকে দেখেছে, দেখতে পেয়েছে?

দু-তিনটি সহপাঠিনীর সঙ্গে কী যেন গুরুতর তর্কে মেতে রয়েছে রত্না। এমনভাবে তাদের সঙ্গে গল্প করছে, কথা বলছে, যেন তার মনেই নেই যে তিমিরকে সে আসতে বলেছে, অপেক্ষা করতে বলেছে।

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল তিমির। বিশেষ করে ট্রামস্টপে এক দল মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বলে।

হ্যাঁ, একবার বুঝি চকিতে তার দিকে তাকাল রত্না, বোধহয় কিছু একটা ইশারা করল। কিন্তু বুঝতে পারল না তিমির। কিংবা তার দৃষ্টির গোপনে কোন ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারল না।

তবু কিছুটা দূরে সরে গেল তিমির। বোধহয় আশেপাশে এতগুলি চপল কিশোরী আর চটুলচোখ তরুণীর দৃষ্টির অস্বস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যেই। তাদের হাসি-কৌতুককথা যেন তিমিরকে উপহাস করছে।

ট্রাম আসছে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল তিমির। আর দেখলে রত্নাও তার সহপাঠিনীদের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে ট্রাম স্টপে।

ট্রাম এল।

সকলের সঙ্গে হাসি কথা কৌতুকের প্লাবন ছড়িয়ে ট্রামে উঠে পড়ল রত্নাও। শুধু চকিতে একবার তিমিরের দিকে তাকিয়ে বুঝি বা ঠোঁট টিপে হাসল। আর তিমির নির্বোধ বিস্ময়ে, ক্রোধে, অসীম বিরক্তিতে দাঁতে দাঁত চেপে পরের ট্রামটার জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

সমস্ত শরীরে যেন একটা বিষাক্ত কামনা গুমরে মরছে।

তিমিরের জীবনে প্রেম যেদিন এসেছিল আকস্মিকভাবে, সেদিন সারা সন্ধ্যা দুঃসহ উল্লাসের যন্ত্রণা ভোগ করেছিল ও, যেদিন হাতের মুঠোয় পাওয়া প্রেম এভাবে অপমানের তাচ্ছিল্যের হাসি ছিটিয়ে দিয়ে সরে গেল, সেদিনও আর-এক দুঃসহ যন্ত্রণায়, ক্রোধে, আত্মধিক্কারে, অপমানে অন্ধ হয়ে উঠল তিমির। মনে হল, শুধুই দারিদ্র্যকে মূলধন করে সপ্তডিঙার সওদাগর হতে চাওয়ার মত নির্বুদ্ধিতা বুঝি আর নেই।

রত্নার চরিত্র যেন রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে যায় ওই একটি দৃশ্য। সহপাঠিনীদের সঙ্গে হাসিতে হেলে-দুলে চলে যাওয়ার মুহূর্তটি মনে পড়লেই আক্রোশে নিজের উপরই ফেটে পড়তে ইচ্ছে হয় তিমিরের। রত্নার হাসি যেন উপহাস হয়ে বাজে।

আশ্চর্য! এ রহস্যের উৎস কোথায়, খুঁজে পায় না তিমির। কেন এমন উপযাচিকার মত এগিয়ে এল রত্না, কেনই বা এমন নিঃশব্দে মিলিয়ে যেতে চায়?

ক্ষণিকের ভ্রান্তি? মোহভঙ্গ? কে জানে?

অভিনয়ের ছলে এমন আঘাত কেন দিল রত্না?

আঘাত পেয়েও, অপমানিত হয়েও সব কথা লুকিয়ে রেখেছিল তিমির, অরুণাভর সামনেও খুলে দেখাতে পারে নি হৃদয়ের ক্ষত-স্থানটুকু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। এ গোপন জ্বালা কারও কাছে প্রকাশ না করলে বুঝি শান্তি পাবে না সে। তাই অরুণাভর কাছেই একদিন ছুটে গেল।

ছুটির দিন।

অরুণাভর খোঁজে বৈঠকখানায় ঢুকতে গিয়েই ধাক্কা খেল তিমির। সামলে নিয়ে মুখ তুলে তাকিয়েই বিস্মিত হল

—মাস্টারমশাই! আপনি? এখানে?

খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের মধ্যে থেকে মাস্টারমশাইয়ের মুখটা হেসে উঠল।

স্মিত হেসে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ বাবা তিমির, এখানেই। মালারা চলে গেল, সবাই তো একে একে চলে যায়, কেউ পাস করে, কেউ বদলি হয়ে, আমিই শুধু থেকে যাই। বলে হাসলেন মাস্টারমশাই।

তিমিরও লজ্জিত হল মাস্টারমশাইয়ের করুণ কণ্ঠস্বরে। যেন বেদনার গভীর কুয়ো থেকে বিষণ্ণ সুর ভেসে এল একটা।

তিমির অস্বস্তি দূর করার জন্যে বলল, অরুণাভর কাছে এসেছি, আমার সঙ্গে পড়ে কলেজে।

—ভালো ভালো। হাসলেন মাস্টারমশাই। অকারণে কোটের ছেঁড়া পকেটের তলা দিয়ে হাতটা বের করে দিয়ে নেড়েচেড়ে নিলেন আঙুলগুলো, তারপর বললেন, আস্তানা একটা পেয়ে গেলাম কিনা। অনেক ছেলেমেয়ে এ বাড়িতে, আর পাঁচ জায়গায় ঘুরতে হবে না।

বলে নির্বোধের মত হাসলেন খানিকটা, তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললেন, আসি।

মাস্টারমশাই বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু তিমিরের মন থেকে নয়।

ওর মনের মধ্যে কেবলই একটা কথা গুনগুন করল। কেন এই পোড়া শহরে, এই দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে আস্তানা খুঁজে খুঁজে জীবনটা নষ্ট করছেন মাস্টারমশাই? কেন? কেন? কী নেশা আছে এ শহরের?

অনেক চিন্তা করেও কোন উত্তর খুঁজে পায় নি তিমির। জীবিকার জন্যে? মিছে কথা। এ-ভাবে টিকে থাকতে হলে এ

শহরের প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর যে-কোন তুচ্ছ প্রান্তেও মানুষ এর চেয়ে ভালভাবে বাঁচতে পারে, জীবনকে উপভোগ করেও বেঁচে থাকতে পারে। তবে ?

অরুণাভর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল যখন, তখনও তিমিরের মন থেকে মাস্টারমশাই মুছে যান নি।

মেসের দিকে হাঁটতে হাঁটতেই চলেছিল তিমির। হঠাৎ টের পেল তার স্যাণ্ডেলের সেই পেরেকটা আবার মাথা তুলেছে; পা ফেললেই বুড়ো আঙুলে লাগছে।

স্যাণ্ডেলটার দিকে একবার তাকাল তিমির। হ্যাঁ, বহু আগেই এটাকে বিদায় দেওয়া উচিত ছিল। অনেকবার জোড়াতালি দিয়ে দিয়ে জুতোটার চেহারাই বদলে গেছে, আর তলাটা ক্ষয়ে গেছে বলেই পেরেকগুলো হঠাৎ এক এক সময় ফুঁড়ে ওঠে, হাঁটতে কষ্ট হয়।

তবু হেঁটে চলল তিমির দুপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে। যদি কোথাও একটা মুচি পাওয়া যায়, পেরেকটা ঠুকিয়ে নেবে।

কিন্তু কোথাও একটা মুচি নেই। দু-বেলা চলতে ফিরতে কত মুচিই তো চোখে পড়ে। অথচ প্রয়োজনের সময় পাওয়া যাবে না একজনকেও। সবই আছে এ শহরে, অথচ যখন যেটি চাই তখনই সেটি পাওয়া যায় না।

মনে মনে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠছিল তিমির।

এদিকে রোদ্দুরে সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে। শীতের সকালে যে রোদ্দুরকে এত প্রিয় লাগে, দশটা বাজতে না বাজতে সেই রোদ্দুরই এত অসহ্য হয়ে ওঠে কেন ?

প্রেমও কি এমনি শীতের দিনের রৌদ্রের মত ? জীবনের প্রত্যূষে লোভনীয়, আর যৌবনের দ্বিপ্রহরে কাঁটার মত খচখচ করে লাগে ? কে জানে !

বেশ খানিকটা হেঁটে এসে ফুটপাথের ধারে গাছতলায় একজন

মুচি দেখতে পেল তিমির। যন্ত্রপাতি নিয়ে ছড়িয়ে বসেছে লোকটা।

তিমির গিয়ে স্যাণ্ডেলটা খুলে দিল তার সামনে।—পেরেকটা ঠুকে দাও তো।

স্যাণ্ডেলের পাটিটা তুলে নিয়ে মুচিটা বললে, হাফস্মুল ভি লাগায় দিব বাবুজী?

—কত নেবে?

—তিন আনা দেবেন, বাবু।

শেষ পর্যন্ত দশ পয়সার রফা হল। তিমির উবু হয়ে বসে পড়ল সামনেই, মুচিটা ততক্ষণ জুতো সারাক।

বসে থাকতে থাকতে একসময় গল্প শুরু করে দিল তিমির। কোথায় বাড়ি তার, কতদিন হল এসেছে কলকাতায়, কত রোজগার!

—দেশে কে আছে তোমার?

মুচিটা হাসল।—জরু আছে, লেড়কা আছে দুঠো।

—জমিজমা নেই?

—আছে বাবুজী, দো তিন বিঘা।

মনের মত শ্রোতা পেয়ে মুচিও গল্প জুড়ে দিল। ছাপরা জিলা থেকে এসেছে আঠারো বছর আগে। মাঝে মাঝে যায়, বউ-ছেলেকে দেখে আসে। জমিজমা যা আছে তাতে পেট চলে না বলেই এসেছিল, কিন্তু এখানে যা রোজগার হয় তা থাকতে-খেতেই খরচ হয়ে যায়, পাঠাতে পারে না বিশেষ কিছু। দেশে থাকলে হয়ত এর চেয়ে ভালই থাকত।

শুনতে শুনতে তিমিরের গলা ভারী হয়ে এল, বললে, তবে দেশেই কেন ফিরে যাও নি? কি আছে কলকাতায়, কেন আছ এখানে?

হাসল মুচিটা।

বললে, এ চপ্পলের কাঁটা লিয়ে বহুৎ তো হাঁটছ বাবুজী। কষ্ট হয় না তুমার? তবু চপ্পল লিয়ে তো মুচি খুঁজতে খুঁজতে আসছ, ফেলে দিয়ে নৌতন জুতা কিনছ না, নঙ্গা পায়ে ভি হাঁটছ না। কেন বাবুজী?

তিমিরও হেসে ফেলল মুচির কথায়। উত্তর দিতে পারল না।

মুচি ততক্ষণে জুতোটা সারিয়ে ফেলেছে। হাফসোল লাগান হয়ে গেছে।

জুতোটা সামনে রেখে দিয়ে শুধু বললে সে, মায়া বাবুজী, সবহি মায়া আছে।

কি আশ্চর্য, শুধু মাস্টারমশাই নয়। সামান্য মুচিটাও এই কলকাতার মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে?

শেষ পর্যন্ত নিজেকে বেঁধে রাখতে পারল না তিমির। অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিল সেদিন। লজ্জায় আত্মধিক্কারে প্রথমটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গিয়েছিল ও, তারপর ক্রমে ক্রমে একটা চাপা ক্রোধ, একটা অন্ধ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠেছিল।

যখনই রত্নার কথা ভাবত, রত্নার কথা মনে পড়ত, সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠত সেদিনের দৃশ্যটুকু। হেলেদুলে হাসি আর কথায় তন্ময় হয়ে সঙ্গী বান্ধবীদের গায়ে রসিকতায় ঢলে পড়তে পড়তে, কখনও বা তাদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে ট্রাম-স্টপে এসে দাঁড়িয়ে ছিল রত্না। ফিরে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছিল তিমিরকে, কিংবা বলা চলে, লক্ষ্যই করে নি। তার ডাকে সাড়া না দিয়ে আসতে পারে নি বলেই এসে দাঁড়িয়েছিল তিমির, অপেক্ষা করেছিল। প্রতিদানে রত্না তার চোখের সামনে দিয়েই উপেক্ষার কটাক্ষ হেনে সহপাঠিনীদের সঙ্গে ট্রামে গিয়ে উঠেছিল।

সারা শরীর জ্বলে গিয়েছিল তিমিরের। ভেবেছিল, আর কোনদিন রত্নার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে না। যদি কোনদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসে রত্না, কথা বলবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে নি তিমির।

বোধ হয় মনের গোপনে কোথাও একটা ক্ষীণ আশা লুকিয়ে ছিল, হয়তো সত্যিই মনের গভীরে ভালবাসা সঞ্চিত হয়েছিল তিল তিল করে। তাই দিনকয়েক পরেই আবার এসে দাঁড়াল তিমির, সেই ট্রাম-স্টপের নির্দিষ্ট স্থানটিতে। অপেক্ষা করল। মেয়েদের কলেজের ঘন্টি বাজল একসময়। এক ঝাঁক নানা রঙের পাখির মত কলকণ্ঠে সমস্ত অঞ্চলটুকু মুখর করে তারা বেরিয়ে এল।

জমল, জটলা করল পথের মোড়ে মোড়ে। ট্রাম এল, ট্রাম চলে গেল। একে একে ভিড় ফিকে হল, তারপর হঠাৎ একসময় আলো নিবে যাওয়ার ম্লানতায় সারা অঞ্চল আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল। আশায় আশায় প্রতিটি মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে গেল তিমির। না, নেই। রত্না আসে নি। রত্না নেই।

ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে ফিরে এল তিমির।

কিন্তু চিরতরে সরে আসতে পারল না।

পরের দিনই আবার গিয়ে দাঁড়াল সেই নির্দিষ্ট ল্যাম্পপোস্টের নীচে। অধীর প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইল কলেজের ফটকের দিকে।

চঞ্চল হয়ে উঠল মনে মনে। হয়তো কোন বিশেষ কারণেই গতকাল রত্না কলেজে আসে নি। আজ নিশ্চয় আসবে সে। আসবে তেমনি হেলেদুলে, হাস্যেলাস্যে মুখর হয়ে, তেমনি রঙের ঝলকি আর রূপের শিখা জ্বালিয়ে।

একা একা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিজেরই অজান্তে কখন পায়চারি করতে শুরু করে তিমির, মনের চঞ্চল উদ্বেগ চাপা দেবার জন্যেই। আর মনে মনে শানানো বানানো কথাগুলো আউড়ে চলে। কল্পনায় যেন রত্নার সঙ্গে কথা বলে চলেছে সে।

সারারাত্রি এমনি কল্পনার কথা বুনে বুনে কাটিয়ে দিয়েছে রত্না।

যেন সেদিনের মতই উৎফুল্ল হাসির ফুলঝুরি ছিটিয়ে সহপাঠিনীদের সঙ্গে নেমে আসছে রত্না, কল্পনার চোখে দেখতে পায় তিমির। যেন তেমনি কৌতুকে ঢলে পড়তে পড়তে এসে দাঁড়াবে সে ট্রাম-স্টপের কাছে, অদূরে-দাঁড়িয়ে-থাকা তিমিরকে লক্ষ্য করেও এড়িয়ে যাবে। ট্রাম থামবে. কেউ নামবে, কেউ বা উঠবে। আর তারই ফাঁকে সঙ্গী মেয়েগুলোর আগে আগে রত্নাও গিয়ে ট্রামে উঠবে।

উঠবে? না, হয়তো উঠতে যাবে সে, আর সেই মুহূর্তে পিছন থেকে ডাকবে তিমির।—রত্না, শোন।

চমকে ফিরে তাকাবে রত্না।

কিন্তু ফিরে না এসে উপায় থাকবে না তার।

ফিরে আসবে। এমন ভান করবে যেন তিমিরকে দেখতেই পায় নি এর আগে। কপট বিস্ময়ে বলবে, তুমি? তিমিরদা, তুমি?

তিমির গোপন ক্রোধ চেপে রাখতে পারবে না। বলবে, এটা থিয়েটারের স্টেজ নয় রত্না।

কী বলছ তুমি? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলবে রত্না। দুচোখ ছলছল করে উঠবে তার, বলবে, বিশ্বাস কর তিমিরদা, তোমাকে দেখতেই পাই নি। সেদিন কত খুঁজলাম তোমাকে···

—মিছে কথা। তিমির এতটুকু নরম না হয়ে বলবে, এখানেই অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেদিন।

আর রত্না হঠাৎ তিমিরের হাতখানা মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে বলবে, ছিলে? এখানে দাঁড়িয়ে ছিলে? ছি ছি, আমি এদিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখি নি। ভেবেছিলাম সেই চায়ের দোকানটায় বসে অপেক্ষা করবে তুমি। গিয়ে কতক্ষণ সেই দোকানটায় একা একা বসেছিলাম সেদিন, তুমি এলে না। কী যে রাগ হয়েছিল, কী বলব!

শুনে হেসে ফেলবে তিমির, মন নরম হবে। অভিযোগ করবে, তুমি তো এখানেই দাঁড়াতে বলেছিলে···

—না, চায়ের দোকানে আসতে বলেছিলাম। ক্রমশ কঠিন হবে রত্নার কণ্ঠস্বর।

তিমির নতি স্বীকার করবে। বলবে, আমারই দোষ। ভুল বুঝে...

হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তিমিরের। তন্ময়তা কেটে গেল। চমকে ফিরে তাকাল সে কলেজের সিঁড়ির দিকে। কলেজের ঘন্টি বেজেই চলেছে তখনও।

কী এত আজেবাজে স্বপ্ন দেখছিল সে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল তিমির কলেজের সিঁড়ির দিকে। অপেক্ষা করে রইল।

একে একে পাঁচটি কি সাতটি মেয়ে বেরিয়ে এল কলেজের ফটক পার হয়ে। একটা মুখও চেনা মনে হল না। না, রত্না নেই।

তবে কি আগের ঘণ্টাতেই রত্নার ছুটি হয়ে গেছে?

একটা বেদনার দীর্ঘশ্বাস তিমিরের বুক নিঙড়ে বেরিয়ে এল। ভালবাসার প্রদীপটুকু একটি দিনের জন্যে জ্বালিয়ে দিয়েই হঠাৎ জীবন থেকে সরে গেল কেন রত্না? এ রহস্যের হদিস পায় না তিমির।

আর এমনি দিনের পর দিন ব্যর্থ হতে হতে একদিন সত্যিই বুঝি রত্নাকে ভুলে গেল তিমির।

ভুলে গেল? না, ভোলবার চেষ্টা করল। পরীক্ষার পড়ার মধ্যে ডুবে গেল ক্রমে ক্রমে।

মানুষ হতে হবে তাকে, বড় হতে হবে। নোংরা মেসের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে হবে। মুক্তি পেয়ে এই অসমতল সমাজের কলকাতা থেকে চলে যাবে সে, এই মাধুর্যহীন মৃত গলিত শবের মত কুৎসিত শহর থেকে চলে যাবে।

এই শহরের বাতাসে বোধ হয় কোন নেশা আছে। বার বার ফিরে ফিরে আসতে হয়। দূরে সরে যাওয়া যায়, শৃঙ্খলটা শুধু দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু এ শহরের মেরুদণ্ড থেকে শৃঙ্খলটা বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

পরীক্ষার পর গ্রামে ফিরে গিয়ে ত্বদিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল তিমির। গ্রাম, তার সেই শৈশবের গ্রাম যেন বদলে গেছে। না, সে নিজেই বদলে গেছে?

গ্রামের দিনগুলো যেন দুঃসহ ঠেকল। এখানে যেন সময়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়েছে কেউ। এক-একটি দিন যেন এক-একটি বছরের মত দীর্ঘ। এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-একটি দিন। সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ থমকে থেমে গেছে এখানে। ছিপ ফেলে মাছ ধরার মত নিঃশব্দ অপেক্ষা আর অপেক্ষা। কোন ঢেউ নেই, কোন শব্দ নেই, কোন নতুন মুখ নেই।

পরীক্ষা পাসের খবর পেয়েই আবার কলকাতায় পালিয়ে এল তিমির। আবার কলেজে ভর্তি হবে, শিক্ষিত হবে, বড় হবে। না, শিক্ষিত হওয়াটাই উদ্দেশ্য নয়। ডিগ্রী পেতে হবে একটা, গ্রাজুয়েট হতে হবে। আর-কিছু নয়। ডিগ্রী না পেলে চাকরি মিলবে না, তাই।

তিমির এটুকু বুঝে নিয়েছে যে বড় হওয়ার মূলে শিক্ষার শিকড় লাগে না। প্রয়োজন শুধু ডিগ্রীর। তা হলেই ভাল চাকরি পাওয়া যায়, বড় হওয়া যায়। কোন্ চাকরি? জানে না। যে-কোন চাকরি। যা পাওয়া যায়।

কিন্তু বড় হওয়া কাকে বলে? কী হবে সে, কী হতে চায়? কিছু না, কিছু না। অনাথ জানে না, অরুণাভ জানে না, তিমিরও জানে না। শুধু জানে এইটুকুই যে কলেজে পড়তে হবে, বড় হতে হবে। একটা ভাসা ভাসা ধারণা, অস্পষ্ট স্বপ্নের মত। ছানিপড়া চোখের দৃষ্টিতে যেন ভবিষ্যৎ দেখছে। কিংবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই ভাবছে না। কেউ তাদের মনে নির্দিষ্ট কোন ভবিষ্যৎ গড়ে দেয় নি। না শিক্ষক, না অভিভাবক।

যুদ্ধের সেই অনির্দিষ্ট দিনগুলোতে সকলেই তখন ভেসে বেড়াতে পেলেই খুশী।

নিজের ভবিষ্যৎ তখন কেউই ভাবছে না, অথচ দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েই যত চিন্তা। একটা মাত্র আবেগ, নিছক আবেগ সকলের মনে। দেশ স্বাধীন করতে হবে, দেশের স্বাধীনতা চাই।

এই সুযোগ। ইংরেজ বিপর্যস্ত। ডানকার্ক থেকে নির্লজ্জের মত সেই যে পালিয়ে এসেছে ইংরেজ সৈন্য, আর ফিরে যাবার পথ পায় নি। ইংরেজের সমস্ত সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। সবাই বুঝেছে, যে সিংহটা এতদিন হুঙ্কার দিচ্ছিল সেটা আসলে তুলোয় ঠাসা। প্রাণ নেই তার, তাই মার খেয়েও মরে না। ফুলে ফেঁপে থাকে। অথচ তারই ভয়ে থমকে চুপ করে আছে সারা ভারতবর্ষ।

মনে মনে অধৈর্য হয়ে ওঠে সকলে। স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

এমনি সময় হঠাৎ একটা গুজব এসে পৌঁছল।

রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ! রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায়!

সকাল থেকেই খবর রাষ্ট্র হতে শুরু হয়েছিল।

দশটা বাজতে না বাজতে জোড়াসাঁকোর ফটকের সামনে ভিড় ভেঙে পড়ল। হাজার হাজার নারী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় ছুটে এল। অপেক্ষা করে রইল এতটুকু সুখবরের আশায়। লোহার ফটক ভেঙে পড়ল ভিড়ের চাপে।

এদিকে প্রত্যেকটি কলেজের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়। রাস্তার মোড়ে জনতা, সকলেই উৎকণ্ঠিত, আতঙ্কিত।

রাজনৈতিক নেতাদের মৃত্যুতেও মানুষ ভিড় করে এসেছে। ব্যথা পেয়েছে, শ্রদ্ধা জানিয়েছে। কিন্তু এ যেন কোন শ্রদ্ধার আকর্ষণ নয়। এ যেন সবচেয়ে প্রিয়জনের বিদায়লগ্ন।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ চলন্ত ট্রাম-বাসের যাত্রীদের প্রশ্ন করে। কিছু শুনে এলেন? খবর পেয়েছেন কিছু?

যে প্রশ্ন করে তার গলার স্বর যত গাঢ় হয়ে আসে, যে উত্তর দেয় তার স্বরেও তেমনি চাপা কান্নার গভীরতা।

সমস্ত পৃথিবী বুঝি বা মহাপ্রলয়ের জন্যেও এমন ভাবে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে না।

কলেজের অধ্যাপকরাও মাঝে মাঝে রাস্তায় ছুটে আসছেন, ছাত্রদের প্রশ্ন করছেন, শুনলে কিছু? ভালোর দিকে তো?

সকলেই জানে চিকিৎসকের দল শেষ আশা-ভরসাও ছেড়ে দিয়েছেন। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় কোথাও যেন একটা ক্ষীণতম আশা উঁকি দিচ্ছে। কোন একটা দৈব-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছে সকলে।

তিমির, অরুণাভ, অনাথ—সকলেই চুপচাপ। এত ভিড়, কিন্তু কথা নেই কারও মুখে।

অনাথ হঠাৎ বললে, রবীন্দ্রনাথ নেই এ-কথা ভাবতে পারিস?

—সত্যি। কী নিয়ে থাকব আমরা, কী থাকবে আমাদের? কান্নার স্বরে যেন ভেঙে পড়ল তিমির। আর ওর চোখের জল দেখে অনাথের চোখেও জল এল।

আশ্চর্য! কোন কবির মৃত্যুতে কে কবে সুস্থ সবল মানুষের চোখে জল দেখেছে? কে দেখেছে এই উৎকণ্ঠা, এই আবেগ?

অরুণাভ বললে, রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিস তুই কখনও?

—না। তুই?

—না।

কেউই দেখে নি ওরা। কবিতা? তাই বা ক-টা কবিতা পড়েছে? এই সেদিনও ঠাট্টা করেছে তাঁর গানকে, গানের সুরকে। শুধুই একটা নামকে কেন্দ্র করে সব ভালবাসা, সব শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়েছে।

বসে থাকতেও যেন কষ্ট হয়। চায়ের দোকানটা থেকে বেরিয়ে এল তিনজনেই। এসে দাঁড়াল রাস্তার মোড়ে।

এর মধ্যেই পুলিসে ছেয়ে গেছে সারা রাস্তা। তবে কি—

হ্যাঁ। মারা গেছেন। খবরের কাগজের বিশেষ সংখ্যা হাঁকতে হাঁকতে ছুটছে হকাররা।

ওরা তিনজনেই তিনখানা কাগজ কিনে নিল।

১২টা ১৩ মিনিট! শেষ বিদায় জানিয়ে চলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বুক নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

হিন্দুস্থানী পুলিস সাব-ইন্সপেক্টারকে কী যেন প্রশ্ন করছে কনস্টেবল একজন।

সজল চোখ তুলে তাকাল তিমির।

কনস্টেবলটা জিগ্যেস করছে, কোন্ আয়গা সাব?

সাব-ইন্সপেক্টর বললে, নাম তো শুনা রবীননাথ, কংগ্রেসকা কোই হোগা।

তিমির শুনল. কিন্তু হাসতে পারল না। সারা শরীর জ্বলে উঠল তার। হঠাৎ কী করে কী হয়ে গেল ও নিজেই বুঝতে পারল না।

উন্মত্ত ক্রোধে টেনে একটা চড় বসিয়ে দিল ও সাব-ইন্সপেক্টরের গালে।

সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ উঠল। কনস্টেবলের দল ছুটে এল। ভিড় ভেঙে পড়ল ওদের ওপর।

সাব-ইন্সপেক্টর ছাড়বার পাত্র নয়। কর্তব্যে রত পুলিসের ওপর হামলা করেছে তিমির, তার শাস্তি পেতে হবে।

হয়তো সত্যিই গ্রেপ্তার করে বসত। কিন্তু সেই সময়েই এসে পৌঁছলেন একজন বাঙালী পুলিস-ইন্সপেক্টর। শুনলেন সব।

গাঢ় গলায় সাব-ইন্সপেক্টরকে বললেন, আজকের দিনে আমাদের বাঙালীদের সব দোষত্রুটি ক্ষমা কর মিঃ পাঠক, তুমি বুঝবে না কি ক্ষতি হয়ে গেল আজ আমাদের!

চোখ সজল হয়ে উঠল তাঁরও।

আর তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে আসতে আসতে তিমির বললে,

রবীন্দ্রনাথ কী ছিলেন, আজ বুঝতে পারলাম অরুণাভ। রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন বলে পুলিসের চোখেও জল রে!

জল? হয়তো আকাশের চোখেও জল এল।

রবীন্দ্রনাথের শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে, সেই মুহূর্তে বৃষ্টি হয়ে গেল ঝিরঝির করে। শান্ত সুন্দর আকাশ বাতাস।

আর লক্ষ মানুষের শোভাযাত্রা। সারা শহর যেন ভেঙে পড়েছে শবযাত্রার পিছনে। ছাত্রের দল, ছাত্রীর দল। যুবা আর প্রৌঢ় মানুষের দল।

কোন কবির শবযাত্রায় এমন ভাবে শহর ভেঙে পড়তে দেখে নি কেউ।

নিজের অজান্তেই তিমিরও দ্রুত হেঁটে চলেছিল শবযাত্রার পিছনে পিছনে।

হঠাৎ ডাক শুনে ফিরে তাকাল।

—তিমিরদা! হাতছানি দিয়ে ডাকল রত্না। তারপর নিজেই সে সরে এল, হাঁটতে শুরু করল তিমিরের পাশে পাশে।

—কী হবে তিমিরদা! যেন পিতার মৃত্যুতে দিশাহারা মেয়ের প্রশ্ন।

কোন উত্তরই দিতে পারল না তিমির।

শুধু নিঃশব্দে হেঁটে চলল শবযাত্রার পিছনে পিছনে, রত্নার পাশে পাশে।

কী আশ্চর্য! যে রত্নার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যে দিনের পর দিন স্বপ্ন বুনেছে তিমির, সেই রত্নাই নিজে থেকে হাতছানি দিল, কাছে এগিয়ে এল, কিন্তু তিমিরের মনে এতটুকু রোমাঞ্চ জাগল না। সমস্ত মন জুড়ে এক অপার্থিব বিষাদ।

গঙ্গার ঘাটের দিকে প্রচণ্ড ভিড়।

দু-জনে দাঁড়িয়ে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর সরে এসে অন্য এক ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসল পাশাপাশি। চুপচাপ বসে রইল।

কোন কথা নেই। কোন প্রশ্ন নেই। কোন অভিযোগ নেই। যেন সব ভুলে গেছে, সব ইতিহাস মুছে গেছে মন থেকে।

বৈরাগ্যের স্বর শোনা গেল রত্নার কণ্ঠে।—এমনি করেই বুঝি সব শেষ হয়ে যায় তিমিরদা! আর কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমাদের এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা!

সন্ধ্যা ঘন হয়ে এল। রাত্রি নামল গঙ্গার জলে। নোঙর-ফেলা নৌকোর সারিতে লণ্ঠন জ্বলল দুটো একটা করে। গঙ্গার ঘোলা জলে আলোর প্রতিবিম্ব, আর অন্ধকার আকাশের গায়ে অসম্পূর্ণ হাওড়া ব্রিজের সেই দৈত্য-কঙ্কালের ছায়া।

এক সময় উঠে দাঁড়াল রত্না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল।

তিমিরও উঠে দাঁড়াল।

জল-কাদায় ভেজা অসমতল পাথরের রাস্তা ধরে নিঃশব্দে হেঁটে চলল দুজনে। যেন গন্তব্যহীন অনির্দেশ যাত্রায় চলেছে।

তারপর একটা রাস্তার বাঁকে এসে রত্না বললে, চলি।

ঘাড় নাড়লে তিমির।

দুজনে দু-পথ ধরল। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে এসেই ফিরে দাঁড়াল তিমির।—রত্না!

রত্নাও ফিরে এল। যেন এই ডাকটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে।

তিমির ধীরে ধীরে বললে, আর দেখা হবে?

প্রাণ খুলে হেসেছিল তিমির সে-রাত্রে। সামান্য একটা কারণে এতখানি ভুল বুঝেছিল সে! সেই নির্দিষ্ট দিনটিতে শুধু সহপাঠিনীদের সন্দেহের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার জন্যেই তিমিরকে উপেক্ষা করে ট্রামে উঠেছিল রত্না।

রত্না হেসে বলেছিল, পরের স্টপেই নেমে পড়েছিলাম বই ফেলে এসেছি বলে।

—মিছে কথা।

সত্যি, বিশ্বাস কর। তিমিরের শার্টের বোতামে হাত রেখে রত্না বলেছিল, ফিরে এসেছিলাম হাঁটতে হাঁটতে। এসে আর তোমাকে দেখতে পেলাম না।

তিমির অনুযোগের স্বরে বলেছে, তার পরেও কতদিন এসেছি। দেখা পাই নি তোমার।

রত্না হেসেছে।—কী জানি, হয়ত কলেজেই আসি নি সেদিন, কিংবা অনেক আগেই ছুটি হয়ে গিয়েছিল।

আর কোন প্রশ্ন করে নি তিমির, অবিশ্বাস করে নি। মনের গোপনে আশঙ্কা ছিল, অবিশ্বাস করলে হয়ত রত্না বলে বসবে, সত্যিই সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল তাকে, প্রথম দিনের আকস্মিক দুর্বলতা কেটে যাবার পর সত্যিই সরে যেতে চেয়েছিল। তার চেয়ে রত্নার কথা যদি অসত্যও হয়, তবু বিশ্বাস করে আনন্দ আছে, তৃপ্তি আছে। অবিশ্বাসে শুধু অপ্রাপ্তির জ্বালা।

মনে মনে জানত সে, সম্পর্কটা আবার সহজ হবে, পাশাপাশি চলার পথ মসৃণ হবে।

হয়েছিল।

কয়েকটা মাস যেন নেশার ঘোরে কেটে গিয়েছিল দু-জনের।

কলেজের ছুটির পর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারত না রত্না। প্রতিদিনই তো আর কলেজের কোন মেয়ের বাড়িতে নোটের খাতা আনতে যাওয়া যায় না। দু-একদিন গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেলে একটা না একটা কারণ দেখান যায়, কিন্তু দিনের পর দিন তা সম্ভব নয়।

তাই দুপুরে ক্লাস পালাতে শুরু করেছিল রত্নাও।

প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিল সে। বলেছিল, রোজ রোজ এ-ভাবে ক্লাস না করলে পার্সেন্টেজ থাকবে কী করে?

—পার্সেন্টেজ? হেসেছিল তিমির। শতকরা চল্লিশটা ক্লাস করলেই পরীক্ষা দেওয়া আটকাতে পারবে না কেউ।

—কিন্তু চল্লিশটাও তো করতে হবে। খিলখিল করে হেসে উঠেছিল রত্না।

তিমির উত্তর দিয়েছিল, প্রক্সির ব্যবস্থা করলেই পার।

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। সহপাঠিনী মঞ্জুলিকার সঙ্গেই ছিল রত্নার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা। বেশ কিছুদিন ধরেই রত্নার গতিবিধি লক্ষ্য করে সন্দেহ পোষণ করছিল সে, প্রশ্নে প্রশ্নে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল রত্নাকে। রত্নার মনেও তখন এক তৃপ্তির আবেগ, প্রণয়ের প্রথম রোমাঞ্চের কথাটা যেন ফোয়ারার মত শত মুখে উৎসারিত না করে আনন্দ নেই। তবু লজ্জায়, ভয়ে, অস্বস্তিতে মঞ্জুলিকার কাছ থেকেও সব কিছু গোপন করে চলেছিল রত্না। পারল না শেষ অবধি।

একদিন সব কথা প্রকাশ করে বলে ফেলল। আর তা শুনতে শুনতে এমন খুশী হয়ে উঠল মঞ্জুলিকা, দু-চোখে নামল এমন স্বপ্নের ছায়া, মুগ্ধ উল্লাস, যেন বান্ধবীর প্রেমকাহিনী নয় নিজেরই প্রথম বসন্ত এসে দ্বারে করাঘাত হানছে।

সব শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল মঞ্জুলিকা। বললে, কিছু ভাবতে হবে না, প্রক্সির ব্যবস্থা আমি করব, কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে।

কৌতুকে হাসল রত্না।—দেব।

সত্যিই একদিন আলাপ করিয়ে দিল রত্না। আর তিনজনে মিলে সেদিনই চলে গেল চৌরঙ্গিপাড়ায় ম্যাটিনি শো-য়ে সিনেমা দেখতে।

ম্যাডান থিয়েটারের সেই বাড়িটার ভোল পাল্টে নতুন নাম হয়েছে তখন 'এলিট'।

ছবিটার নাম 'রেবেকা'। তখনও চৌরঙ্গিপাড়ার বাইরে নাতিশীতোষ্ণ শীততাপ ব্যবস্থার রেওয়াজ হয় নি।

তিন জনেরই হাতে বইখাতা, দুরুদুরু বুক তিন জনেরই। যদি পরিচিত কেউ দেখতে পায়, যদি সামনাসামনি পড়ে যায় কোন নিকটাত্মীয়। এতখানি মুক্তির বাতাস তো তখন ছিল না।

রত্না একখানা টিকিট তিমিরের হাতে দিয়ে বললে, আপনি আগে গিয়ে বসুন, আলো নিবলে যাব আমরা।

—'আপনি' কী রে? খিলখিল করে হেসে উঠল মঞ্জুলিকা।

আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনেই লজ্জিত হয়ে পড়ল। অস্বস্তি কাটাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে গেল তিমির।

রত্না বললে, কেউ দেখতে পায় তো বলব তোর সঙ্গে এসেছিলাম। ওকে আমরা চিনিই না। বুঝলি? বলে হাসল।

মঞ্জুলিকাও হাসল। বললে, তোর নয় স্বার্থ আছে, রিস্ক নেওয়া চলে, আমার মিছেমিছি ঝুঁকি নেওয়া কেন বল্ তো? আমার কী লাভ?

রত্না হাসল।—তোর জন্যে একটা জুটিয়ে দিতে বলব নাকি?

কথা শেষ করতে না করতেই 'উঃ' করে চিৎকার করে উঠল রত্না, কষে একটা চিমটি কেটেছে মঞ্জুলিকা।

রত্নার ঈষৎ চিৎকারে এক জোড়া সাহেব মেম কোমর ধরাধরি করে যেতে যেতে ফিরে তাকাল। আর সেই মুহূর্তে দরজার ফাঁক থেকে দেখা গেল, ভিতরের আলো নিবে গেছে।

রত্নার রঙিন মুগ্ধ মনও যেন নরম কর্পেটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। আবছা অন্ধকারের বাতাসে ভাসতে ভাসতে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসল দুজনে। ছায়া-ছায়া আলোয় তিমিরকে অনুভব করল রত্না। তিমিরের সান্নিধ্য।

কিন্তু তিমিরের চোখ যেন পর্দার দিকে নয়। কিংবা শুধু চোখ দুটোই পর্দার দিকে, আর সারা শরীরের রোমকূপগুলো যেন অনুভবের চোখ মেলে তাকিয়ে আছে রত্নার দিকে। বড় চঞ্চল দেখাচ্ছে যেন রত্নাকে। একবার ওদিকে ঢলে পড়ে ফিসফিস করে কী যেন বলছে মঞ্জুলিকাকে, কখনও এদিকে মুখ নিয়ে এসে অকারণ কিছু-একটা প্রশ্ন করছে।

তিমির কিন্তু অচঞ্চল। স্থাণুর মত বসে আছে চুপচাপ। ছবির দিকে চোখ রেখে, মনের মলাট খুলে রেখে।

মাঝে মাঝে চাপা স্বরে হাসির শব্দ। মঞ্জুলিকা কি কিছু একটা রসিকতা করল? কে জানে! হয়তো তিমিরকে কেন্দ্র করেই কোন রসিকতা করেছে, কিংবা উপহাস!

কেমন যেন সঙ্কুচিত বোধ করল তিমির।

ছটফট করতে করতে এক সময় হাতলের ওপর হাত রাখল রত্না। নরম শুভ্র একখানি হাতের স্পর্শে চমকে উঠল তিমির, তবু হাত সরাল না। পাশাপাশি দুখানি হাত পরস্পরের স্পর্শ অনুভব করে শুয়ে আছে। দুখানি নিরাবরণ হাত নয়, যেন সেই প্রাগৈতিহাসিক আদিমতার যুগে দুটি বন্য নারী আর

পুরুষ শুয়ে আছে পাশাপাশি। হাত নয়, যেন মূক নিঃশব্দ ভাষাহীন দুটি দেহ পরস্পরকে স্পর্শ করে মুখর হয়ে উঠতে চায়।

চোখের ওপর দিয়ে ছবির মিছিল কখন পার হয়ে গেছে, কোন্ এক মুহূর্তে অকস্মাৎ আলো জ্বলে উঠে সচকিত করে তুলেছে ওদের দুজনকে, আর দুজনেই সলজ্জ চোখে ফিরে তাকিয়েছে মঞ্জুলিকার দিকে।

সিনেমা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মঞ্জুলিকা বললে, রেবেকার অভিনয় খুব ভাল হয়েছে, না রত্না ?

—হ্যাঁ, চমৎকার। সায় দিয়ে বলল রত্না।

সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে হেসে উঠল মঞ্জুলিকা। তিমির আর রত্না—দুজনেই বুঝতে পারল না হাসির কারণ; এ ওর মুখের দিকে তাকাল।

মঞ্জুলিকা হেসে বললে, আমি জানতাম।

—কী জানতিস ? বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলে রত্না।

-মঞ্জুলিকা হেসে বললে, তোমরা কেউই ছবি দেখ নি।

—মানে ? কথাটা সত্যি জেনেও প্রতিবাদ না করে পারল না রত্না।

মঞ্জুলিকা হেসে বললে, যাকে নিয়ে গল্প সেই রেবেকাকে তো দেখানোই হয় নি।

তিমির বললে, তা হবে, আমি ইংরেজি ছবি কিছু বুঝতেই পারি না।

সত্যি হোক, তবু সে-কথাটা এমন সরলভাবে বলবে কেন তিমির ? বিশেষ করে রত্নার কোন বান্ধবীর কাছে। ভীষণ চটে গিয়েছিল রত্না।

পরের দিন দুজনেই কলেজ পালিয়ে নিরুদ্দেশভাবে এ গলি ও-গলি পায়চারি করতে করতে চলেছিল প্রতিদিনের মতই।

বুকে বইখাতা দু-হাতে আগলে রত্না হাঁটছিল তিমিরের পাশে পাশে। চোরা চোখে তাকিয়ে দেখছিল মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ, চেনাশোনা কেউ না দেখতে পায়।

একটা আঁকাবাঁকা নির্জন গলির অনেকখানি পার হয়ে একসময় মুখ খুলল রত্না।

সরোষে বললে, ইংরেজী ছবি বুঝতে না পারা তোমার ধারণায় বুঝি খুব গর্বের ব্যাপার?

এমন একটা সহজ সরল উক্তিতে রত্না যে চটে যাবে, রত্না যে চটে গেছে তা ভাবতেও পারে নি তিমির।

তিমির হেসে হাল্কা হবার চেষ্টা করল। বললে, সত্যি কথা বললেও দোষ? ইংরেজী ছবি আমি যে বুঝতে পারি না।

কিন্তু রাগ গেল না রত্নার। বললে, অনেক ব্যাপারেই তো মিছে কথা বল, এই একটা ব্যাপারেই যুধিষ্ঠির হওয়া কেন?

অপরাধীর ভঙ্গিতে মাথা চুলকে তিমির বললে, আর বলব না।

এতক্ষণে মুখে হাসি দেখা গেল রত্নার। কিন্তু পরক্ষণেই সেটা লজ্জায় অস্বস্তিতে মিলিয়ে গেল। দোতলার বারান্দা থেকে স্থুলাঙ্গী এক মহিলা আর কমবয়সী একটি মেয়ে তাদের লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে কী যেন বলছে। আশ্চর্য, পৃথিবীসুদ্ধ সব লোকই যেন ওদের ওপর চোখ রেখে আছে।

এর আগে অন্য একটা গলি ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেত মানিকতলার দিকে। কিন্তু সে গলিতে পর পর তিন-চার দিন যেতেই পাড়ার মেয়ে-বউরা কেমন অনুসন্ধিৎসু. হয়ে উঠেছিল। দেখতে পেলেই কী ফিসফিস করে বলত নিজেদের মধ্যে, হাসত,

টীকাটিপ্পনী কাটত। তারপর এ-বারান্দার মেয়েরা ও-বারান্দার মেয়েদের লক্ষ্য করে বলত, চখাচখি যাচ্ছে।

এতে লজ্জা পেত রত্না! বাধ্য হয়েই তাই পথ বদলেছে। কিন্তু এখানেও তাই।

তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে বড় রাস্তায় পড়ল রত্না।

বাস-স্টপের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। কী করবে, কোন্ দিকে যাবে, ভাবল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই লক্ষ্য করলে, ওপারের পানের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা চ্যাংড়া ছোকরা হাসাহাসি করছে।

হঠাৎ তাদের একজন রাস্তার একটা কালোকুলো ছেলেকে ডাকলে। কালো কালো নেংটি-পরা ছেলেগুলো মিঠাইয়ের দোকানের সামনের রাশিকৃত ঠাণ্ডা ছাইয়ের গাদায় কুস্তি লড়ছিল।

ডাক শুনে তারা এগিয়ে গেল ছোকরাটার কাছে। কী যেন বললে সে। রত্না বেশ টের পেল তাকে উদ্দেশ করেই কিছু বলছে ছোকরাটা।

একটু ভয় ভয় করল রত্নার, তাড়াতাড়ি সরে যেতে ইচ্ছে হল সেখান থেকে, কিন্তু পারল না।

তার আগেই কালোকুলো ছাই-মাখা ছেলেগুলো এসে ঘিরে ধরল রত্নাকে।—একটা পয়সা দে দিদি, একটা পয়সা দে মা।

রত্না বিরক্ত হয়ে ধমক দিলে, তাড়াতে চাইলে।

কিন্তু ছেলেগুলোও নাছোড়বান্দা। ময়লা হাত দিয়ে রত্নার শাড়ি টেনে ধরে; আর মুখে এক কথা।—একটা পয়সা দে দিদি, একটা পয়সা দে মা।

একটা ছেলে তার মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী, যেন পায়ের সঙ্গে লেপটে যেতে চায়।

পা জড়িয়ে ধরেই সে হঠাৎ বললে, একটা পয়সা দে দিদি, ওই বাবুর মত বর হবে তোর, একটা পয়সা দে দিদি।

লজ্জায় লাল হয়ে রত্না তিমিরের মুখের দিকে একবার তাকাল, হাসল, তারপর আশেপাশে একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেছে দেখতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে সদ্য-থামা বাসটায় উঠে পড়ল। পিছনে পিছনে তিমিরও।

বাসে উঠে তিমির প্রশ্ন করলে, কোথায় যাবে?

—তোমার মেসে। উত্তর দিল রত্না।

একটা দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে তিমিরের। প্রতিদিনের মতই বই-খাতা বুকে চেপে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল রত্না। তারপর তুজনে চলে গিয়েছিল কার্জন পার্কে।

তখন তো ট্রাম-কোম্পানির টার্মিনাস হয় নি ওখানে; ও-তল্লাটে এত ভিড়ও ছিল না। চৌরঙ্গি এলাকাটাই অনেক শান্ত ছিল, কার্জন পার্ক আরও।

শীতের বিকেলে তখন বাতাস সিরসির করতে শুরু করেছে। আর বিকেল হতে-না-হতেই কলকাতার রাস্তাঘাটে কেমন একটা ধোঁয়াশা নেমে আসত। ধোঁয়া আর কুয়াশা। তার মধ্যে নিরুদ্দেশভাবে পথ চলতে ভালো লাগত না। তার ওপর আবার নতুন বিরক্তি। দিনের পর দিন ওদের তুজনকে একসঙ্গে ঘোরা-ঘুরি করতে দেখে পাড়ার লোকগুলো, বিশেষ করে যারা পানের দোকানের সামনে গুলতানি করত তারা হাসাহাসি করত, টীকাটিপ্পনী কাটত, কখনও কখনও ইচ্ছে করেই অন্যমনস্কতার ভান করে রত্নার গায়ে ধাক্কা দিয়ে যেত।

নিরুপায় হয়েই প্রথম প্রথম সহ্য করে যাচ্ছিল রত্না।

নতুন উপদ্রব শুরু করল রাস্তার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো, যারা মিঠাইয়ের দোকানের ঠাণ্ডা ছাইয়ে কুস্তি লড়ত, ডাস্টবিন ঘাঁটত, হাসতে হাসতে রাস্তায় গড়াগড়ি দিত।

রত্না আর তিমিরকে দেখলেই ছুটে এসে হাত পাতত তারা, কখনও কখনও রত্নার পাটভাঙা নতুন শাড়িটা নোংরা করে দিত পা জড়িয়ে ধরে, পয়সা না দিলে ছাড়ত না, পয়সা দিলে আশপাশ থেকে আরও দশটা সাঙ্গপাঙ্গকে ডেকে আনত।

বাধ্য হয়েই তাই রত্না বললে, আজ চল কার্জন পার্কের দিকে যাই। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে এদিকে। তাছাড়া এদের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে।

সেই পুরনো দিনের দোতলা বাসের ওপরতলায় উঠে এসে একেবারে সামনের আসনে গিয়ে বসল দুজনে। দোতলার সব জানলাগুলোই খোলা, ঝড় বয়ে যায় যেন। বেশ লাগত পরম তৃপ্তিতে কাঁধে কাঁধ স্পর্শ করে বসে থাকতে। চুল উড়ত রত্নার, পিছনের লোকটার মুখের ওপরও বুঝি দু-এক গুছি উড়ে গিয়ে পড়ত। হাসতে হাসতে চুল ঠিক করত সে, আর পিছন ফিরে চুল ঠিক করার অজুহাতে সারা বাসটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিত, কেউ কোথাও চেনাজানা আছে কি না!

আর এই উদ্দাম বাতাসে এক-এক সময় যেন ছেলেমানুষের মত হয়ে যেত রত্না, খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠত সামান্য কথায়, এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখত সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে, দেখে খুশী হত।

বলত, দেখছ, সব্বাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

তিমির হেসে বলত, তুমি নেমে গেলে আবার যে উঠবে তার দিকেও তাকিয়ে থাকবে।

কপট অভিমানে রত্না বলত, তোমরা পুরুষরা তো অমনিই

—তোমরা?

—যাকে ভাল লাগল তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যেতে চাই।

তিমির কী যেন আবার বলত, তার আগেই রত্না হঠাৎ বলত, আচ্ছা, আগেকার দোতলা বাস দেখেছ, যখন ছাদ থাকত না?

—না। শুনেছি।

গেঁয়ো বলে আবার হয়তো খোঁটা দিত রত্না, তার আগেই

বাসটা মোড় নিল। আর হুড়মুড় করে দুজনই উঠে পড়ল। রাস্তা পার হয়ে কার্জন পার্কে ঢুকল।

সমস্ত পার্ক জুড়ে সবুজ মখমল, ধারে ধারে নানা রঙের ফুল, পাতাবাহার। মাঝখান দিয়ে সরু একটা নুড়ি-ছড়ানো রাস্তা এ-কোণ থেকে ও-কোণ অবধি।

তখনও সূর্য ডোবে নি, কিন্তু পেরামবুলেটারে ফিরিঙ্গীদের গোলগাল বাচ্চাগুলোকে বসিয়ে আয়ার দল বেড়াতে শুরু করেছে। ঘাসের ওপর খেলা করছে কয়েকটা ফরসা গোলগাল ছেলেমেয়ে। কেউ ফড়িং ধরবার চেষ্টা করছে।

রত্না আর তিমির এসে বসল একটু নির্জন দেখে এক কোণে, ঘাসের ওপর। বেশ কিছুটা দূরে ঝোপটার পাশে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণ আর তরুণী। বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। দুজনেরই চাপল্যে যৌবনের উষ্ণতা।

সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল রত্না, তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা চিনেবাদাম-ওয়ালাকে ডাকল।

হাতে কয়েকটা শিশি বোতল ঝুলিয়ে সবুজ-শার্ট-পরা একটা ছোকরা বার বার ঘুরে যাচ্ছে: মালিশ! মালিশ চাই, মালিশ!

চিনেবাদাম চিবোতে চিবোতে রত্না হঠাৎ বলল, এই, আমার বিয়ে। কথা হচ্ছে। বলে হাসল।

কথাটা কয়েকদিন ধরেই বলব বলব করেও বুঝি বলতে পারছিল না রত্না। কৌতুকের চাঙ্কেই শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল।

তিমির হেসে বললে, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সত্যি বলছি।

—আমাকে নেমন্তন্ন করবে তো?

—হুঁ। শুধু খাওয়ার নয়, পরিবেষণ করতে হবে কোমরে গামছা বেঁধে। বলে খিলখিল করে হেসে উঠল রত্না।

কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল রত্না। বললে, হাসি নয়। সত্যি।

তিমিরের দুটো হাত চেপে ধরেছে রত্না, দুটি করুণ চোখ মেলে তাকিয়েছে তিমিরের মুখের দিকে।

তিমির বুঝতে পারে নি, অভিনয় কি না।

তবু মুখে বলেছে, ভয় নেই রত্না, তেমন দিন যদি সত্যিই আসে, তোমার মনই উপায় বাতলে দেবে।

কিন্তু মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে ভয় পেয়েছে তিমির। মনে হয়েছে, শুধু রত্নার মনই তো উপায় বাতলে দিতে পারে না, তাকেও উপায় খুঁজে নিতে হবে।

বিষণ্ণ মন নিয়ে মেসে ফিরে এল তিমির। দুর্গাচরণ মিত্র রোডের মেসবাড়িতে। সেই ক্লেদাক্ত অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায়। রাস্তার ওপর ভাঙা দরজাটা সব সময়েই হাট করে খোলা থাকে। সেটা পার হয়ে এসে বাঁ দিকে দু-তিনখানা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর, পাশেই রান্নাঘর, কয়লার ধোঁয়া, ঠাকুর আর ঝিয়ের চিৎকার। শ্যাওলা-পড়া কলতলা পার হয়ে ডান দিকেই সিঁড়ি। মানুষের-পায়ে-পায়ে-ক্ষয়ে-যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে ওপর থেকে ময়লা জল গড়িয়ে পড়ে পিছল হয়ে উঠেছে।

এই সিঁড়ি বেয়ে রত্না এসেছিল একদিন। এসেছিল দোতলার এই নোংরা ঘরে। ভাবলেও মনটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেদিন কোন অস্বস্তি বোধ করে নি তিমির।

রাস্তার ছেলেগুলোর জ্বালায় তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়েছিল রত্না, পিছনে পিছনে তিমির।

—কোথায় যাবে এ পথে? জিজ্ঞেস করেছিল তিমির।

—তোমার মেসে।

কথাটা শুনেই বুকটা ধক করে উঠেছিল তিমিরের। যে আশঙ্কায় একদিন রত্নাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, সে আশঙ্কারই মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হল।

সেদিনের কথা ভাবতে গিয়ে হাসি পায় তিমিরের। তার গ্রাম্য-মনের দুঃসাহস কবে থেকে এমন নিবে গিয়েছিল কে জানে। যে গ্রামের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত সে, যে দারিদ্র্যের অহঙ্কার ছিল তার মনে, অরুণাভ-অনাথদের কাছে যা প্রকাশ করে বলতে লজ্জা তো দূরের কথা, বরং গর্ব অনুভব করত, সামান্য একটি মেয়ের ভালবাসা হারাবার ভয়ে, সেই দারিদ্র্যকেই গোপন করতে চেয়েছে সে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন শক্ত করেছিল তিমির, মানুষ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও বোধ হয় এমন মরিয়া হয়ে ওঠে না।

সায় দিয়ে বলেছে, বেশ তো, চল।

দুজনে সেদিনও এসে বসে ছিল পাশাপাশি। তারপর গল্প করতে করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। যেন সারা বাসে কেউ কোথাও নেই, শুধু ওরা দুজন।

পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ে মৃদু মৃদু কথা, হাসি। রত্নার হাঁটুর ওপর আলগোছে-ফেলে-রাখা তিমিরের হাত, তিমিরের কাঁধে রত্নার কনুই। দুটিতে তন্ময় হয়ে গল্প করতে করতে দুটো স্টপ পার হয়ে চলে এসেছিল।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে ফিরে গিয়েছিল আবার মেসের রাস্তায়।

মেসবাড়ির সামনে পৌঁছে তখন আর কোনও সঙ্কোচ ছিল না তিমিরের। সমস্ত শরীরে তখন একটা নেশার উত্তাপ। এই পার্থিব জীবন থেকে অনেক দূরে।

রত্নাকে সঙ্গে নিয়ে মেসে ঢুকতেই মেসের ঠাকুর ফ্যালফ্যাল

[illegible] [illegible] কিয়ে রইল, তু-একজন বোর্ডার চোখোচোখি হতেই, চমকে [illegible]।

কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকল ওরা।

তুখানা তক্তাপোশ ঘরে, ও-পাশেরটা এক কেরানীবাবুর। আপিসের ফাইলপত্র নিয়ে কী দেখছিলেন তিনি। রত্নাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিলেন। পরক্ষণেই মৃতু হেসে ফাইলপত্র গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রত্না হেসে বললে, তোমার রুম-মেট তো বেশ ভদ্র।

তিমিরও হাসল।

কিন্তু তারপরই দরজার সামনে শুরু হল পায়চারি। তিমির বেশ বুঝতে পারল খবরটা রটে গেছে সারা মেসে। আর প্রত্যেকেই একবার করে পায়চারি করে রত্নাকে দেখে যাচ্ছে আড়-চোখে।

তিমির চাপা গলায় বললে, আজ আমার প্রাণ যাবে।

—কেন, প্রাণ যাবে কেন?

তিমির বললে, দেখছ না। বলে দরজার সামনে বোর্ডারদের পায়চারির দিকে ইঙ্গিত করল। বললে, কত জবাবদিহি দিতে হবে তুমি চলে গেলে।

কী বলবে? কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞেস করল রত্না।

তিমির উত্তর দিল, যা সত্যি তাই।

—সত্যি কী? বল না। আত্নরে ঢঙে হেলে তুলে চোখে কৌতুকের হাসি ছিটিয়ে তাকিয়ে রইল রত্না তিমিরের মুখের দিকে।

ধীরে ধীরে উঠে এসে দরজার নোংরা গুটোন পর্দাটা টেনে দিল তিমির, তারপর ফিরে এল রত্নার কাছে।

স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখল রত্নাকে। ঠিক যেন এমন চোখে

আর-কোনদিন দেখে নি সে রত্নাকে। মনের চোখ দিয়েই যে দেখে এসেছে এতদিন, শরীরের চোখ দিয়ে নয়।

একটা উদ্দাম আনন্দের শিহরণ যেন সহস্র চক্ষুর পিপাসা নিয়ে তাকাল একটি নিটোল যৌবনোদ্দীপ্ত নারীদেহের দিকে। দুটি কালো চোখের গভীরতায় এ কোন্ রহস্য? কৌতুকের মৃদু হাস্যে মুখর অধরে ওষ্ঠে এ কোন্ বিস্ময়?

মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইল তিমির।

রত্নার দিকে নয়। সেই পরিচিতা প্রগলভার দিকে নয়। এক অজানা রহস্যের দিকে, একটি মোহময় যৌবন-শরীরের দিকে।

তিমিরের উন্মাদ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল রত্না। আবার নাটকীয় কৌতুকের স্বরে টেনে টেনে নাকী সুরে বললে, কী বলবে, কী সত্যি, বল না!

—এই।

ছোট্ট একটি উত্তর। তারপরই উদ্দাম আবেগে রত্নার কোমল শরীরকে দুটি লুব্ধ বাহুর আলিঙ্গনে বুকে টেনে নিল তিমির।

জালে-পড়া একটি অসহায় পাখির মত পাখা ঝটপট করল রত্না!

ধীরে ধীরে আলিঙ্গন শিথিল করে দিল তিমির। কিন্তু তখনও তার বুকের গোপনে রত্নার কোমল হৃদপিণ্ডের স্পন্দন শোনা যায়।

চঞ্চল বিভ্রান্ত দুটি চোখ মেলে তাকাল রত্না, অপ্রতিভের মত হাসল, তারপর বললে, চলি আজ।

চলে গেল রত্না।

রেখে গেল শুধু স্মৃতি নয়, তার উন্মত্ত যৌবনদেহের স্পর্শ।

সেই প্রথম ভয় পেয়েছিল তিমির, রত্নাকে হারাবার ভয়। কার্জন পার্ক থেকে ফিরে এসে কোথায় দুদণ্ডের আলাপের স্মৃতি

রোমন্থন করবে তা নয়, মনের মধ্যে রত্নার সেই কথা কটি। রত্নাকে [illegible] ভয়টা মনের মধ্যে ঘুরতে শুরু করল।

মেসের ঘরে একা একা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল তিমির। শার্টে মাথা গলিয়ে কী যেন ভাবল একবার।

রুম-মেট ভদ্রলোকও বেরিয়ে গেছেন, অন্যান্য সকলে কেউ পার্কে বেড়াতে গেছে, কেউ ট্যুইশনি করতে। দু-একজন আপিস থেকে ফিরে কোন দোকানের খাতা লিখে দিতে গেছে।

তক্তাপোশের পাশেই দেয়ালের সেল্‌ফে চিঁড়ে ভিজানো আছে, ঝি দই নিয়ে এসে রেখে গেল। চিঁড়ে-ভিজানো বাটি থেকে জলটা ছেঁকে ফেলে দিয়ে দইটা মেখে কোন রকমে যেন নাকেমুখে গুঁজে নিল। ক্ষিদেয় পেট চিনচিন করছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা দুশ্চিন্তার।

তিমির বুঝতে পেরেছে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। স্বাবলম্বী না হতে পারলে রত্নাকে হারাতে হবে। অতএব চাকরি জুটিয়ে নিতে হবে একটা। কিন্তু কোথায় পাবে চাকরি ?

ঘরে তালা লাগিয়ে বেরোল তিমির। গলির মোড়ে একটা ছোট্ট লাইব্রেরি আছে, সেখানে এসে খবরের কাগজের কর্মখালির ওপর চোখ বুলিয়ে গেল। দু-একটা ঠিকানা টুকে নিল, কিন্তু সে জানে দরখাস্ত করে কোনই কাজ হবে না। এমন অনেক দরখাস্ত করতে দেখেছে সে মেসের অন্যান্য অনেককে।

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসেই হঠাৎ অরুণাভর বাবার কথা মনে পড়ল তার। শুধু অরুণাভ নয় আরও অনেকের কাছে শুনেছে, সরকারী বে-সরকারী দু মহলেই নাকি প্রতিপত্তি আছে ভদ্রলোকের। সাধারণ একটা চাকরি জুটিয়ে দেওয়া এমন কিছু শক্ত নয় তাঁর পক্ষে। অরুণাভকে একবার বলে দেখবে সে, না কি নিজেই বলবে তাঁকে ?

কয়েক মুহূর্ত ভাবল তিমির। তারপর পকেটে হাত দিয়ে দেখল তিন দাগ দেওয়া ট্রামের ট্রান্সফার টিকিটটা রয়েছে। মনে মনে হিসেব করল। হ্যাঁ, আজকেও তিন দাগের দিন। এক লাইনের ট্রাম বদলি করে অন্য লাইনে যাবার টিকিট তখন একসঙ্গে কাটা যেত, একটা পয়সা সস্তা হত তাতে। আর অনেকেই তাই প্রয়োজন না থাকলেও ট্রান্সফার টিকিট কাটত, পরে আবার কোন তিন দাগের দিন এলে সেই টিকিটেই সমস্ত পথটাই যাওয়া যেত। ফাঁকিটা ধরতে পারত না কণ্ডাক্টর।

অরুণাভদের বাড়ি যাবার উদ্দেশ্যে ট্রামে উঠে বসল তিমির, আর কণ্ডাক্টর টিকিট দেখে চলে যাবার পর মনে মনে হাসল সে। কী বোকাই না ছিল সে যখন প্রথম এসেছিল কলকাতায়! কলেজের গেটের সামনে নেমে মনে পড়েছিল টিকিট কাটতে ভুলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরের বাসেই চলে গিয়েছিল টার্মিনাস পর্যন্ত। দশটা পয়সা খরচ করে পাঁচটা পয়সা দিয়ে এসেছিল আগের বাসটার ভাড়া।

নিজের মনেই হাসল তিমির। কী বোকাই না ছিল সে। বোকা? না, ভেতরে ভেতরে সে বদলে গেছে?

কিন্তু কী ভাবে কথাটা পাড়বে সে ব্রজবাবুর কাছে? অরুণাভর বাবা ব্রজবাবুর কাছে যথেষ্ট প্রিয় হয়ে উঠেছে সে ইতিমধ্যে।

সেই প্রথম দিন বলেছিলেন, তোমার বাবা নেই এখানে, কিন্তু এই জ্যাঠামশাইটি আছে, যখন যা দরকার পড়বে এসে বলো, কেমন?

তারপর বহুবার গেছে সে অরুণাভরদের বাড়ি, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, প্রতিবারই আদর করে কাছে বসিয়েছেন, গল্প করেছেন, তিমিরের দৃঢ় বিশ্বাস একটা সামান্য চাকরি তিনি ইচ্ছে করলেই করে দিতে পারবেন। ধনী জমিদার হলেও সরকারী মহলে তাঁর কথার দাম

আছে। আগে একটা কন্ট্রাক্টরী ফার্ম ছিল, সেটা নাকি সম্প্রতি ফেল মেরে উঠে গেছে। তবু আলাপ তো আছে অনেকের সঙ্গে। কিন্তু কথাটা কী ভাবে পাড়বে তিমির?

হাঁা পেয়েছে। চাকরির দরখাস্ত করতে হলে দুটি সার্টিফিকেট দিতে হবে সঙ্গে। কলকাতার শেরিফ নাকি যেন তিনি, শুনেছিল। সুতরাং তাঁর কাছেই সার্টিফিকেট চাইবে, আর সেই সূত্রে বলবে, একটা চাকরি তার প্রয়োজন।

দু মাথায় দুটো সিংহ বসানো ফটক পার হয়ে মার্বেলের নগ্ন নারীমূর্তিটার পাশ দিয়ে এসে বাড়ির ভেতর ঢুকতে গিয়ে আবার সেই মুখটা দেখতে পেল তিমির।

অপূর্ব সুন্দরীর একটি মুখ। সাদা থান-কাপড়ে আবৃত যুবতী-দেহ। চোখে চোখ পড়তেই সরে গেল সে।

এ এক রহস্য তিমিরের কাছে। বহুবার দেখেছে, বহুবার বিস্মিত হয়েছে, জানতে ইচ্ছে হয়েছে তার পরিচয়। কিন্তু কোনদিনই প্রশ্ন করতে পারে নি অরুণাভকে।

মনের মধ্যে হয়ত ওই সুন্দর মুখখানি রহস্যের জাল বুনে চলেছিল। তাই মীরার কথায় চমকে উঠল তিমির।

—এই তিমিরদা! সিদ্ধি খেয়েছেন নাকি? মীরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

আর চমকে তাকাল তিমির।—টুনু আছে?

—আছে তো। খিলখিল করে হেসে উঠল মীরা, তারপর বললে, মনে মনে কী ভাবছিলেন?

—কিছু না। অপ্রতিভ হাসি হাসল তিমির।

তারপর বৈঠকখানা ঘরটিতে ঢুকেই দেখল, অরুণাভ বসে বসে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে ব্রজবাবুকে।

ব্রজবাবু তিমিরকে দেখতে পেয়েই তাকিয়া ঠেলে সোজা হয়ে

বসলেন : এস, এস বাবা আমার। কী খবর বাবা তিমির ?

তিমির কোনও উত্তর দিতে পারল না। এমন সাদর অভ্যর্থনা বুঝি ও কল্পনাও করতে পারে নি। মনে মনে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল ও, লজ্জিতও। ফরাশের এক পাশে জড়সড় হয়ে বসল।

মীরাও ততক্ষণে বাপের পিঠের কাছে এসে বসেছে। সে হাসল তিমিরের অবস্থা দেখে।

ব্রজবাবু বললেন, উঠে এস তিমির, এখানে এস।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়েই বসল তিমির।

তিমির নিজেই ভেবে অবাক হল, অন্যদিন কত সহজে এসে বসেছে সে ব্রজবাবুর কাছে, কত অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলতে পেরেছে, আর আজ কাছে বসতে অস্বস্তি। যে-কাজের জন্যে এসেছে সে, যে-কথা বলতে এসেছে তা অতি সামান্য, তবু এই সঙ্কোচ কেন ?

কিন্তু না বলেও উপায় নেই।

শেষ পর্যন্ত এক সময়ে বলেই ফেলল তিমির। বললে, আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে জ্যাঠামশাই।

ব্রজবাবু মৃদু হেসে তিমিরের পিঠে আদরের হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের সার্টিফিকেট বাবা ? কলেজের কিছু—

—না। একটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করব।

—চাকরি ? চাকরি করবে কী এখন থেকে ? পড়াশুনো শেষ কর আগে। সহানুভূতির সঙ্গেই বললেন ব্রজবাবু।

তিমির একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, পড়া তো হলই না, এখন কিছু রোজগার না করতে পারলেও চলবে না, আমাদের অবস্থা তো জানেন—

ব্রজবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে

থেকে বললেন, দেখব চাকরি কোথাও দিতে পারি কি না। কিন্তু আমার সার্টিফিকেটে কোনও কাজ হবে না বাবা, বরং অন্য কোথাও দেখ।

তিমিরের সমস্ত মুখ লজ্জায় থমথম করে উঠল। কী লজ্জা, কী লজ্জা! যাঁর ওপর অনেক বেশী ভরসা ছিল তার, অনেক বেশী কিছু পাবার আশা যেখানে, তাঁর কাছ থেকে সামান্য একটা সার্টিফিকেটও পাওয়া যাবে না, ভাবতে পারে নি সে। এ যেন একটি রাজ্য পাবার আশা নিয়ে এসে সম্রাটের কাছ থেকে একটি তামার মুদ্রা না পাওয়ার মত লজ্জা।

মিনিট কয়েক চুপ করে বসে থেকে তিমির বললে, চলি আজ।

উঠে পড়ল তিমির, রাগে লজ্জায়। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল, অরুণাভর জন্যে অপেক্ষাও করল না। কিন্তু বেশ খানিকটা এসেই মনে হল, অরুণাভকে দুটো কথা বলে আসা উচিত ছিল।

না, ফিরে গিয়ে কাজ নেই। হয়তো শুনবে, ব্রজবাবু বলছেন, সার্টিফিকেট দিতে কি আর আপত্তি, কিন্তু এই যুদ্ধের সময় অচেনা অজানা কাউকে সার্টিফিকেট দিয়ে কি বিপদে পড়ব?

ব্রজবাবুর ভালবাসাটুকু উবে যায় নি, তিমির জানে। কিন্তু ভয়ে সে ভালবাসাকে মর্যাদা দিতে পারেন নি তিনি।

সে নিজেও কি—

মেসে ফিরে এসেই দুখানা চিঠি পেল তিমির। একখানা তার বাবা লিখেছেন, আর একখানা হলদে রঙের বিয়ের চিঠি। মেসের ঝি বললে, সেই দিদিমণি এসেছিল গো বাবু, অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেলেন। চিঠিটা দিয়ে গেলেন।

হলুদ রঙের ছাপা চিঠিটা দ্রুত খুলল তিমির। এক কোণে রত্নার হাতের তিনটি লাইন: "আমার বিয়ে। কাল চারটের সময় কলেজের সামনে থেক। কী করতে হবে জেনে নেব।"

ঘরের তালা খুলে তক্তাপোশের ওপর বসে পড়ল তিমির। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছে।

এমন দিন যে আসবে তা জানত তিমির, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসবে, ভাবতে পারে নি।

ধীরে ধীরে ছাপা চিঠিটাও পড়ল তিমির, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু রত্নার নাম ছাড়া আর-সব কিছুই কেমন অস্পষ্ট, অবোধ্য, ধোঁয়া-ধোঁয়া। একটা কুয়াশার মত।

"কাল চারটের সময় কলেজের সামনে থেক।"

কী হবে সেখানে গিয়ে, কী হবে দেখা করে! হয়তো সত্যি-কথাটা বলতে বাধবে, হয়তো মিথ্যে একটা আশা দিয়ে আসবে।

অনেকক্ষণ কী যেন ভাবল তিমির, কিংবা কিছুই ভাবল না।

বাবার চিঠিটা খুলে পড়ল এবার। সাধাসিধে চিঠি, কুশল প্রশ্ন উপদেশ, আশীর্বাদ। আর কিছু নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তক্তাপোশের ওপর শুয়ে পড়ল তিমির। না, আজ আর কলেজে যাবে না। এই ব্যথা, এই দুশ্চিন্তা নিয়ে কলেজে গিয়ে কী লাভ! তার চেয়ে···

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল তিমির। এক ধরনের ভয় দূর হয়ে আরেক ধরনের আতঙ্ক চেপে বসেছে তখন মনের ওপর।

রত্নাকে হারাবার আশঙ্কায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিল তিমির। বৃথাই পথ খুঁজেছে, উপায় খুঁজেছে। যেন একটা অন্ধকার কক্ষে ছুটে বেড়িয়েছে একটা উন্মাদ হরিণ—যে দিকেই আলোর আশায়, মুক্তির আশায় ছুটে গেছে, সে দিকেই ধাক্কা খেয়েছে কঠিন দেয়ালে, ব্যর্থতার দেয়ালে। শেষে আশাহত ক্লান্তিতে অদৃষ্টের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে সে। আর সেই মুহূর্তে এসেছে দুঃখের, যন্ত্রণার তৃপ্তি।

কল্পনার কানে যেন সানাইয়ের সুর শুনতে পেয়েছে তিমির।

এই ভালো, এই ভালো। এই পথেই বুঝি মুক্তি। এত বড় একটা দায়িত্ব কখন যে সে নিজের অজ্ঞাতে কাঁধে তুলে নিয়েছে তিমির তা বুঝতে পারে নি। এখন, এই মুহূর্তে সেই দায়িত্বটা থেকে মুক্তি পেলেই যেন সে বেঁচে যায়।

"কাল চারটের সময় কলেজের সামনে থেকো।"

না, যাবে না তিমির। থাকবে না নির্দিষ্ট সময়ে। দেখা করবে না আর রত্নার সঙ্গে। কী হবে অপরাধের বোঝা বাড়িয়ে।

ক্রমশ আরেকটা ভয় এসে জুড়ে বসল তার মনে। রত্নাকে হারাবার ভয় নয়, হারাবার ব্যথা নয়। রত্না হয়তো আবার আসবে, এই আশঙ্কা। হয়তো শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলবে তাকে, তার দুর্বল জীবনের সঙ্গে হয়তো আরেকটি জীবনকে জড়িয়ে নিতে বলবে রত্না, এই আতঙ্ক।

দিন পার হয়ে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল তিমির।

তারপর এল সেই বিশেষ লগ্ন।

সেই হলদে চিঠিটা হাতের মুঠোয় মুচড়ে দুমড়ে ফেলেও ছুঁড়ে দিতে পারে নি পথের ডাস্টবিনে। এক সময় আবার সেটাকে খুলে ধরেছে, নড়বড়ে টেবিলটার ওপর মেলে হাতের চাপ দিয়ে দিয়ে ভাঁজগুলো সমান করেছে। পড়েছে রত্নার হাতে লেখা তিন লাইনের পুনশ্চটুকু। তারপর তুলে রেখেছে সযত্নে।

সালটা ভুল হতে পারে, কিন্তু তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে তিমিরের ১৫ই ফাল্গুন, বুধবার।

বার বার চিঠিটা পড়েছে তিমির।

তারপর সেই ১৫ই ফাল্গুনের সন্ধ্যা এসেছে। আর সঙ্গে এনেছে অদ্ভুত এক ব্যথা, অসহ্য যন্ত্রণা।

সন্ধ্যে হতে না হতে যখন কাশী বোস লেনের শামিয়ানার নীচে আলো জ্বলে উঠল, সানাই সুর ধরল, তখন দুর্গাচরণ মিত্র

রোডের দোতলা মেস-বাড়িটার আলসেতে ভর দিয়ে তিমির একমনে উদাস চোখে তাকিয়ে ছিল তারা-জ্বলা আকাশের দিকে।

ক্ষণে ক্ষণে ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার, কাশী বোস লেনের সেই পুরনো দিনের রোমাঞ্চস্নিগ্ধ বাড়িটায় উঁকি দিয়ে আসতে। মালাদের বাড়ির পর আরও তুখানা বাড়ি পার হয়েই রত্নাদের বাড়ি।

ছোটমামার বাসা থেকে কলেজে যাওয়ার সময় কতদিন ফিরে তাকিয়েছে সে ওই বাড়িটার দিকে, বাড়ির জানলাটার দিকে। প্রতিদিনই সেই হাসি-হাসি মুখ আর অর্থপূর্ণ দৃষ্টির বিনিময়ে বিদায় জানিয়েছে রত্না। কতদিন!

অসহ্য এক যন্ত্রণা। নিজের ভয় আর আতঙ্কের কথা ভুলে গেল তিমির। ভুলে গেল স্বেচ্ছায় এই বিচ্ছেদ ডেকে এনেছে সে। পরিবর্তে সব অপরাধ ঢেলে দিল রত্নার উদ্দেশে। মনের কাছেই অভিযোগ করলে, কেন আর-একবার এসে দাঁড়াল না রত্না!

মেসের আলোবাতাসহীন গুমোট অন্ধকারে বসে থাকতে ইচ্ছে হল না। জামাটা মাথা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিমির।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখল শামিয়ানায় সাজানো বিবাহ-মণ্ডপ। কাছে যেতে ইচ্ছে হল একবার। পোশাক পরিচ্ছদ বদলে এসে যাবে নাকি একবার? কেউ কিছু মনে করবে না, তা জানে তিমির। বরং খুশীই হবেন প্রকাশবাবু, হয়তো বলবেন, তোমার ঠিকানা জানতাম না বলেই নিমন্ত্রণ করতে পারি নি। রত্নার মা হয়তো আরও খুশী হবেন। ঘরের ছেলের মত মনে করতেন এক সময়, ঘরের ছেলের মতই ব্যবহার করবে নাকি তিমির? গিয়ে বলবে, রত্নার বিয়ের খবর শুনেই এলাম, রবাহূত হয়েই।

কিন্তু রত্না? সে কি খুশী হবে? না, অস্বস্তি দেখা দেবে তার মুখে চোখে? প্রতারণা করেছে, প্রবঞ্চনা করেছে সে, মুছে ফেলে দিয়েছে এতদিনের অন্তরঙ্গতা, চন্দনে চিত্রিত হয়ে দেখছে

নতুনের স্বপ্ন। এ-সময়ে হঠাৎ যদি তিমির গিয়ে হাজির হয়, খুশি হতে পারবে না রত্না, পারবে না।

তাছাড়া রত্নার মা কি চিনতে পারবেন তিমিরকে? এই এত বছর বাদে?

সানাইয়ের সুর কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গেল। তন্ময়তা কেটে গেল তিমিরের।

ধীরে ধীরে মেসে ফিরে এল সে পথ থেকে। দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল গলিপথটার দিকে তাকিয়ে।

তারপর এক সময় সারা মেস নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে এল। একে একে সব বাসিন্দারাই বেরিয়ে গেল—কেউ সান্ধ্যভ্রমণে, কেউ কেনাকাটার জন্যে, কেউবা গেল ট্যুইশানি করতে।

দোতলার ঘরগুলোর ওদিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা ছাদ। বারকয়েক পায়চারি করল তিমির, নিরুদ্দেশ ভাবে। একবার এসে দাঁড়াল ছাদের আলসের ধারে, তাকিয়ে রইল সামনের রাস্তার দিকে।

গ্যাসের আলো জ্বলছে সারি সারি। নিশ্চল পাহারাদারের মত দাঁড়িয়ে আছে গ্যাসপোস্টগুলো, দূরে দূরে। আর ম্লান ধোঁয়াটে আলোর সঙ্গে অন্ধকারের লুকোচুরি।

ওদিকের রাস্তার গ্যাসপোস্টগুলো অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে পাশে। আলো জ্বলে না। আলো জ্বলে না বলেই স্মৃতির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবে, দেখে, চিন্তা করে, হয়তো বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোটদের চাঞ্চল্য দেখে, যুবক-যুবতীদের উচ্ছল ঔজ্জ্বল্যে। হ্যাঁ, গ্যাসপোস্ট-গুলো নির্লিপ্তের জ্যোতিহীন চোখ মেলে সামনের নতুন থামগুলোকে দেখে, যার মাথায় অসংখ্য তারের জটিল জটলা, যার মাথায় উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলো জ্বলে।

দুর্গাচরণ মিত্র রোডের গ্যাসপোস্টগুলোও হয়তো একদিন এমনি পরিত্যক্ত হবে, বেকার বৃদ্ধের মত তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু না, ইলেকট্রিকের আলো আসে নি এখনও এ রাস্তায়। আসবে।

রত্নাও আবার আসবে, ভেবেছিল তিমির। কিন্তু…

হঠাৎ চমকে উঠল সে।

গ্যাসপোস্টের নীচে ধোঁয়াটে আলো, জলে-ভেজা নীচের রাস্তাটা চকচক করছে। রাস্তার ওপারে খোলার বস্তিতে দু-চারটে লণ্ঠনের আলো। টুং টাং শব্দ, কাশি, হাসি।

হঠাৎ চমকে উঠল তিমির।

রত্না?

দ্রুতপায়ে নেমে এল তিমির, ছুটে বেরিয়ে এল। একেবারে রাস্তার মাঝখানে।

লাল বেনারসীতে সাজানো, সারা অঙ্গে অলঙ্কার, গালে কপালে চন্দনের ফোঁটা। যেন বিয়ের পিঁড়ি থেকে এইমাত্র উঠে এসেছে।

ভীত, বিস্মিত তিমিরের মুখ থেকে শুধু অস্ফুটে একটি প্রশ্ন বের হল, রত্না তুমি?

দু হাত বাড়িয়ে ঢলে পড়ল রত্না।

আর তিমির কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, এ কী ছেলেমানুষি করছ রত্না, এ কী ভুল করছ?

—ভুল? অসহায় দেখাল রত্নাকে।

—হ্যাঁ রত্না, ভুল। ফিরে যাও রত্না, ফিরে যাও তুমি।

ফিরে গিয়েছিল রত্না। যে-কপাট নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে এসেছিল সেই কপাটের কড়া নাড়তে চেয়েছিল আবার।

আর তিমির! অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে সে। কি করবে সে,

কী করতে পারে! এমন আকস্মিক ভাবে, প্রস্তুতির সময় না দিয়ে কেউ যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, কী করতে পারে তিমির?

তার সাহস হয় নি বলেই কি তার প্রেম মিথ্যা? রত্নার হাত ধরে জীবনের নদীতে পাড়ি দিতে পারে নি বলেই কি তার মনের দাহ নিবে গেছে?

শুধু স্তম্ভিত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল বলে নয়, রত্না এ-ভাবে হঠাৎ এসে পড়েছিল বলে আতঙ্কও কম হয় নি তিমিরের। আর তাই, সেদিন ইচ্ছে সত্ত্বেও রত্নাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে নি তিমির।

পারে নি বলেই দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত ঘুমোতে পারে নি।

ভোরের মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়ায় কিছুক্ষণের জন্যে শুধু চোখ জুড়ে এসেছিল। তারপরই মেসের কোলাহলে ঘুমের তন্দ্রা ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল গত রাত্রির দৃশ্যটা।

এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। সারাক্ষণ মাথার মধ্যে চিন্তার জট ক্রমশই জটিল হয়ে ওঠে। বুকের ভেতর কী এক অবোধ্য বেদনা! মন থেকে তাড়াতে চায় তিমির, পারে না। সেই একই কথা বার বার চিন্তা করে, সেই একই ব্যথা বার বার অনুভব করে। চোখ উদাস হয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু মন গুমরে মরে।

দুশ্চিন্তার জালে জড়িয়ে গেছে যেন, আর একটা বীভৎস মাকড়সা যেন তার দিকে আতঙ্কের মত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। তাকে তাড়াবার সাহস নেই, এগিয়েও সে আসে না। শুধু ভয়ের চোখে তাকিয়ে থাকা, শুধু হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গোনা।

কিন্তু রত্না কি ফিরে গিয়েছিল? কাশী বোস লেনের শামিয়ানার নীচে কি সানাই সুর ধরেছিল আবার? শাঁখ বেজেছিল?

জানতে ইচ্ছে হয় তিমিরের, কিন্তু জানবার কোন উপায় যে নেই।

দূর থেকে আবার কাশী বোস লেনের কাছ দিয়ে ঘুরে আসতে ইচ্ছে হল একবার। পরক্ষণেই মত বদলালো।

কিন্তু দুশ্চিন্তাটা দূর করবে কী করে? কী করে মুক্তি পাবে এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে?

'সারাটা দিন কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারল না তিমির। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না! একটা চিন্তার বঁড়শি যেন তাকে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর স্রোত থেকে তুলে ধরেছে। মাছের মতই যেন ছটফট করছে সে। শব্দ, কথা, অনুভূতি সব হারিয়ে গেছে। কথা যেন দূর থেকে ভেসে আসা অর্থহীন কোলাহল। ক্ষুধা নেই, ঘুম নেই। ঘুম আসতে চায় না চোখের পাতায়, চোখের পাতা থেকে ঈষৎ তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলেই সেই এক দুশ্চিন্তা।

কয়েকটা দিন এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে শেষ অবধি মন ঠিক করে ফেলল তিমির। বেরিয়ে পড়ল জামাটা গায়ে দিয়ে।

ধীরে ধীরে, বার বার মত বদলে, বারংবার থেমে-থমকে দাঁড়িয়ে কখন নিজেরই অজান্তে কাশী বোস লেনের মোড়ে এসে পৌঁছল। দূর থেকে তাকাল বাড়িটার দিকে।

না, এখন আর কোন চিহ্ন নেই। বিবাহ-মণ্ডপের সব স্মৃতি মুছে গেছে। এখন আর মনে হয় না কোনদিন এখানে ত্রিপল টাঙান হয়েছিল, আলো জ্বলছিল, সানাই সুর ধরেছিল।

তিনটি বাচ্চা ছেলে রাস্তার ধারে লাট্টু খেলছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল তিমির। একজন লেত্তি পাকাচ্ছে লাট্টুর গায়ে। নীচে একটা লাট্টু পড়ে আছে, বেশ বড়োসড়ো আকারের।

একটা ছেলে ঠাট্টা করে বললে, চিনু, তোর লাট্টুটা এমন মোটা-সোটা হল কী করে রে?

যে লেত্তি জড়াচ্ছিল, সে লাট্টুটা ঘোরাল, ঘুরন্ত লাট্টুটা হাতে তুলে নিয়ে বললে, প্রকাশ জ্যাঠাদের বাড়িতে বিয়ের ভোজ খেয়ে মোটা হয়েছে মাইরি!

তিনজনেই হেসে উঠল।

তারপর একজন বললে, জামাইবাবুটা বেশ দেখতে কিন্তু, না রে ?

কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল আরেকজন, তার আগেই রাস্তার ওধার থেকে পাঁচ ছটা ছেলে ছুটে এল চিৎকার করে।—এই যে, এই ছেলেটা ! একজন আরেকজনকে দেখিয়ে দিল।

তারপরই মারামারি, চিৎকার।

পুরনো কোন কলহের সূত্র ধরে মারামারি শুরু করল ছেলেগুলো।

অন্যদিন হলে হয়তো ঝগড়া-ঝাঁটি থামাবার চেষ্টা করত তিমির।

কিন্তু ওর বুক থেকে তখন একখানা ভারী পাথর নেমে গেছে। কী শান্তি, কী শান্তি !

তাড়াতাড়ি মেসে ফিরে এল তিমির। সব দুশ্চিন্তা যেন মুছে গেছে। সব আতঙ্ক চোখ থেকে সরে গেছে।

স্নান সেরে খেয়ে নিয়েই বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়ল তিমির। আর লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে এল। ঘুম। ঘুমের মত তৃপ্তি বুঝি আর কিছুতে নেই। ঘুমের মত জ্বালাহর বুঝি আর কিছু নেই।

যেন কত দিন পরে ঘুম নামল তিমিরের চোখে। যেন পরিশ্রান্ত জীবনের শেষে মৃত্যুর মত বিশ্রাম।

অরুণাভর ডাকে ঘুম ভাঙল যখন, রাত আটটা বেজে গেছে।

ধড়মড় করে উটে বসল তিমির। আঃ, এতক্ষণে সমস্ত অবসাদ দূর হয়েছে শরীর থেকে, মনের দুশ্চিন্তা ঘুচে গেছে।

অরুণাভকে দেখে বললে, কী রে, হঠাৎ ?

অরুণাভ এ-কথার কোনও উত্তর দিল না। প্রশ্ন করলে, কী হয়েছে তোর বল্ তো ?

—কী আবার ?

—তা হলে এ-ভাবে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিস কেন ? এতদিনের মধ্যে একদিনও গেলি না কেন আমাদের বাড়ি ?

তিমির হেসে ফেলল। অরুণাভ বুঝি ভেবেছে তার ওপর অভিমান করেই যায় নি আর ?

হেসে বললে, না রে, এমনি যাওয়া হয়ে ওঠে নি। একটা ঝড় বয়ে গেল কিনা আমার ওপর দিয়ে।

—ঝড় ?

তিমির হাসল।—হ্যাঁ, ঝড়ই তো। সে তোকে সব বলব পরে। এখন শোন্, আমি কালই দেশে চলে যাব ঠিক করেছি, ফিরব মাস কয়েক পরে···

অরুণাভ হেসে বললে, না, দেশে পালাতে হবে না তোকে। বাবা তোর চাকরি ঠিক করে ফেলেছে, এ আর পি-র চাকরি।

—এ আর পি ? কিন্তু আমার আর চাকরির দরকারই নেই যে।

অরুণাভ বুঝল না কিছুই। বললে, তুই কাল গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করিস।

বলেই চলে গেল অরুণাভ।

আর তিমির মনে মনে হাসল। এ আর পি-র চাকরি ? দুদিন আগে হলে হয়তো তাও আশীর্বাদ মনে হত। কিন্তু···

হঠাৎ ছাদের এক কোণে হট্টগোল উঠল একটা। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সে।

মেসের সকলে, কালিকাবাবু, মুকুন্দবাবু, মল্লিক, সাহানা— সবাই জটলা পাকিয়ে এত হইহই করছে কেন ?

তিমির কাছে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে মুকুন্দবাবু ?

পরনে লুঙ্গি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কাঁচাপাকা চুল, সামনের দুটো

উঁচু হয়ে থাকা দাঁত—মানুষটার সমস্ত শরীর যেন ফুর্তিতে হেসে উঠল।—'কী হয়েছে? কী হতে আর বাকী আছে মশাই? শুনুন না নিজের কানে...

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝল তিমির। পাশের বাড়িতে রেডিও চলছে—রেডিওয় চলছে যুদ্ধের খবর।

হিটলারের জার্মানী যখন একটার পর একটা দেশ জয় করে চলেছিল তখন প্রত্যেকটা লোক যেন মনে মনে খুশী হয়ে উঠছিল। কিন্তু তারপর কেমন যেন ঝিমিয়ে এসেছিল সব উৎসাহ। জাপান যুদ্ধে নামার পর সে উৎসাহ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেল।

প্রিন্স অফ ওয়েলস্ জাহাজ ডুবে গেছে সিঙ্গাপুরে—ডুবিয়ে দিয়েছে জাপান। তারপর একে একে জয় করেছে ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর, মালয়...

আর শত্রুপক্ষের রেডিও বলছে, এখন জাপানী সৈন্য নাকি বর্মায় ঢুকে পড়েছে।

কয়েকটা দিনের মধ্যে বন্যার মত বেগে এগিয়ে আসছে জাপানীরা, প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ব্রিটিশ আর আমেরিকান সৈন্য।

মল্লিক সওদাগরী আপিসের কেরানী। আনন্দের মধ্যেও আতঙ্ক দেখা দিল তার মনে। বললে, যুদ্ধের দৌলতে মাইনেটাইনে বেশ তো বাড়ছিল মশাই, মাগ্গী ভাতার ব্যবস্থা হয়েছে গত মাস থেকে, র‍্যাশন দিচ্ছে আপিসে, কিন্তু জাপানী ব্যাটারা যদি এখানেও হানা দেয়?

মুকুন্দবাবু হাসলেন।—আরে দূর মশাই, শোনেন নি খবর, স্থভাষ বোস বর্মায় এখন, কলকাতায় বোমা ফেলতে পারবে না ওরা।

মল্লিক চটে গেল।—ওসব গুজব মশাই, গুজব। বিজ্ঞাপন দেখছেন না দেয়ালে দেয়ালে, 'গুজবে কান দেবেন না'।

ক্রমশ তর্ক আলোচনা সশব্দ হয়ে উঠল। কালিকাবাবু, মুকুন্দবাবু, মল্লিক, সাহানা—সকলেই যেন যুদ্ধবিশারদ, রাজনীতি যেন তাঁদের চেয়ে বেশী কেউ বোঝে না।

আলোচনা শুনতে শুনতে তিমির নিজেও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তর্ক করতে শুরু করে। তারপর এক সময় আলোচনা থেমে যায়, বুড়ো বীরেশ্বর মুকুজ্যের কথা শুনে।

দড়ি আর আলকাতরার একটা দোকান আছে মুকুজ্যের, গড়পারের দিকে। খুব সাবধানী লোক।

বললে, চেঁচাবেন না মশাই, চেঁচাবেন না, দেয়ালেরও কান আছে।

সকলেই ভুলে গিয়েছিল, এক মুহূর্তে সকলে চুপ করে গেল ভয়ে।

এতদিন যুদ্ধটা দূরে দূরে ছিল। আতঙ্কিত হবার মত নয়, আলোচনা আর তর্ক করার, নিরুপদ্রব শান্তিতে উপভোগ করার মত। যে মন নিয়ে রেডিও খুলে ফুটবল খেলার রীলে শুনতো সকলে, কাগজের ওপর আঁকা মাঠে বলের অবস্থান ঠিক করত, ঠিক সেই মন নিয়েই এতদিন পৃথিবীর মানচিত্র সামনে রেখে যুদ্ধের খবর শুনছিল সকলে।

হঠাৎ একদিন কলকাতার আকাশেও বোমারু বিমানের গোঙানি শোনা গেল। আর এ গোঙানি যেন একটু অন্য ধারার, প্রতিদিন যে প্লেনগুলো আঁকাশে টহল দিতে শুরু করেছে তার গুঞ্জন নয় যেন। গুজবও রটে গেল, জাপানী প্লেন ঘুরে গেছে কলকাতার ওপর দিয়ে, নিশানা ঠিক করে গেছে বোমা ফেলার জন্যে।

দু-একদিন সাইরেনও বেজে উঠল অতর্কিত ভাবে, অসময়ে।

আশঙ্কার সাইরেন বাজল, বিপদ-ক্রান্তির সাইরেনও বাজল। না, বোমা পড়ল না কোথাও।

কেউ বলল, জাপানী প্লেন এসেছিল। কেউ বলল, বোমা পড়লে লোকগুলো কীভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এইটুকু শেখাবার জন্যেই এ-সব ব্যবস্থা। কেউ ভয় পেল, কেউ পেল না।

কিন্তু তিমির হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করল, মেসের অধিকাংশ ঘরেই তালা পড়ে গেছে।

ভয় পেয়েছে এ-কথা স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা পেয়েছে। তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে একে একে অনেকেই সরে পড়েছে। যে কজন আছে তাদের অনেকের গায়ে উঠেছে খাকী পোশাক। কেউ

এ আর পি-তে চাকরি পেয়েছে, কেউ পোর্ট কমিশনারে চাকরি করে, কিন্তু কাঁধের স্ট্র্যাপে ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়ার চিহ্ন এঁকেছে, দলে দলে ডাক্তাররা ছুটেছে মিলিটারীর মোটা মাইনের লোভে।

বিভ্রান্ত বোধ করে তিমির কলকাতার এই চেহারা দেখে।

বাবার চিঠি আসছে ঘন ঘন, কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এস।

চিঠি পেয়ে কখনও বিরক্ত হয় সে, কখনও হাসে। এত ভয় পাবার কী আছে খুঁজে পায় না। মৃত্যুর কথাও ভাবতে পারে না সে, তার সমবয়স্ক বন্ধুরা। দিব্যি কলেজে যায়, গল্পগুজব করে, আড্ডা দেয় চায়ের দোকানে, আর যুদ্ধবিশারদের মত আলোচনা করে।

লোকগুলোকে ভয়ে পালাতে দেখে মনে মনে হাসে।

কিন্তু ভাবতে পারে নি, অরুণাভরাও শেষ পর্যন্ত পালাবে শহর ছেড়ে। পর পর দিন কয়েক অরুণাভকে কলেজে না আসতে দেখে একদিন ছুটির পর গিয়ে হাজির হল সে তাদের বাড়িতে।

দারোয়ানটা তেমনি ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে খৈনী টিপতে টিপতে গল্প করছিল হাতে-বালতি-ঝুলোনো দুটো গয়লার সঙ্গে।

তিমিরকে ঢুকতে দেখেই হাসল দারোয়ান।—টুনু বাবুলোগ-তো ভাগলবা!

তিমির চমকে ফিরে তাকাল তার দিকে।—নেই?

—বানারস ভাগলবা সবকোই। উল্লাসে হাসল দারোয়ান।

কী আশ্চর্য, অরুণাভও তাকে না বলে চলে গেছে?

চুপ করে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল তিমির। সামনের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে। কয়েকটা রাজমিস্ত্রী একটা দেয়াল তুলছে বাড়িটার সামনে—ব্যাফ্‌ল-ওয়াল। বোমা পড়লে যাতে স্প্লিণ্টার না ভেতরে ঢুকতে পারে।

ব্যাফ্‌ল্-ওয়াল! সারা কলকাতা জুড়ে রাস্তায় রাস্তায় গলিতে

গলিতে দেয়াল উঠছে। বোমা নয়, মানুষগুলোকেই যেন বিভ্রান্ত করে দিতে চায়, তাদের সব স্বপ্নকে পরাজিত করতে চায় এই যুদ্ধ!

তোড়জোড় চলছে ওদিকে কংগ্রেসী বৈঠকে। গান্ধী শেষ যুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করার ইচ্ছে জানিয়েছেন। দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়তে হবে, ডাক দিয়েছেন তিনি।

আর এদিকে নোটের রাশি ছড়িয়ে দিয়ে দেয়াল তুলছে ইংরেজ সরকার।

যে চাকরির জন্যে একদিন হন্যে হয়ে ঘুরেছে তিমির, সেই চাকরি আজ চাইলেই পাওয়া যায়। আর চাকরির সঙ্গে একটা খাকী ইউনিফর্ম গায়ে তুললেই উপরি টাকা পাওয়া যাবে মুঠো মুঠো, অল্পমূল্যে র‍্যাশন।

ভারাক্রান্ত মনে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন বড় রাস্তায় এসে পৌঁছেছে তিমির, খেয়ালই হয় নি। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠল।

চতুর্দিক থেকে লোক ছুটে এল, স্তম্ভিত হয়ে কেউ বা দূরেই দাঁড়িয়ে রইল।

দৈত্যদেহ মিলিটারী ট্রাক্‌খানার গতি কমলো না এতটুকু। একটা পিঁপড়েকে পায়ে মাড়িয়ে মানুষ যেমন জানতেও পারে না কিছু, জানতে চায় না, তেমনি নির্বিকার চিত্তে ট্রাক্‌টা ছুটে চলে গেল! কালো পীচের রাস্তায় শুধু পড়ে রইল খানিকটা লাল রক্ত, জমাট বেঁধে যাওয়া তাজা রক্ত।

ভিড় করে ছুটে এল অনেকে। তিমিরও গিয়ে উঁকি দিল।

মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, হাতে ছিল একটা র‍্যাশনের থলি, আর টুকিটাকি একরাশ জিনিসপত্র।

একটা ছোট্ট আয়না।

এক মুহূর্ত আয়নাটার দিকে তাকাল তিমির। একটা দীর্ঘশ্বাস

বেরিয়ে এল তার বুক নিঙড়ে। তারপর সকলের মত সেও সরে এসে দাঁড়াল ট্রাম স্টপে।

এ তো নিত্যদিনের ঘটনা। এর আগেও বহুবার দেখেছে, পরেও হয়তো বহুবার দেখবে। দার্শনিকের মত দাঁড়িয়ে দেখবার, ভাববার কিংবা সমাজহিতৈষীর মত একটা কিছু করবার অবকাশ কোথায়? সাহস কোথায়? না, এদেশে সাহস নেই বুঝি একটা মানুষেরও। ভীরু, ভীরু সব মানুষগুলো।

শুধু খবরের কাগজের পাতায় যত কিছু আস্ফালন!

ট্রামেব সামনের আসনে বসে এ-কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন অধৈর্য হয়ে উঠল তিমির।

ক্রীপ্‌স্‌ মিশন! ক্রীপ্‌স্‌ সাহেব এসেছেন একটা কিছু বোঝাপড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে।

হঠাৎ তিমিরের মনে হল সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা প্রহসন। কী প্রয়োজন এত কথা কাটাকাটির! এত যুক্তিতর্কের!

যুদ্ধের ডাক দিচ্ছে না কেন কংগ্রেস? তিমিরের মত অনেকেই হয়তো ছুটে যাবে তা হলে। অনেকেই হয়তো তার মত অধৈর্য হয়ে উঠেছে মনে মনে।

বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মনে মেসের পথ ধরল তিমির। সন্ধ্যে হয়ে আসছে তখন। আবছা অন্ধকার রাস্তা নির্জন হয়ে আসছে ক্রমশ।

—সেলাম ছোট বাবু!

চমকে উঠেছিল তিমির সামনের লোকটাকে দেখে। প্রথমটা চিনতে পারে নি।

গায়ে ঢিলে খাকী কুর্তা, পায়ে পট্টি, কাঁধে একটা মই।

পরক্ষণেই চিনতে পারল তিমির। এ কী বেশ হয়েছে লোকটার? শেষ পর্যন্ত এরও গায়ে সেই উর্দি উঠেছে?

—কী বলরাম, তুমিও খাকী পরেছ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল তিমির।

বলরামকে দুবেলা দেখতে পায় তিমির, দুবেলা দেখেছে বলরামের মেয়ে আলোকে। মেসের জানলা থেকে সামনের বস্তিতে বলরামের ঘর দেখতে পায়। কিন্তু এমন পরিবর্তন চোখে পড়ে নি কোনদিন।

কথাটার অর্থ বুঝল বলরাম। তবু হাসল, বললে, কী আর করি বাবু, খেতে হবে তো।

তিমির কোন কথা বলল না, আর বলরাম বোধ হয় বুঝল তিমির তার এই পোশাক পছন্দ করছে না। তিমিরের খদ্দরের পাঞ্জাবিটার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল বলরাম। তারপর বললে, এতকাল তো আলো জ্বেলে এলাম বাবু, পেটের ভাত জুটল না। এখন আলো নেবাবার কাজ নিয়ে দেখছি, টাকায় পকেট ভরে যায়।

বিস্মিত হল তিমির। বলে কী লোকটা—আলো নেবাবার কাজ? মানে?

হাসল বলরাম। কাঁধের থলে থেকে একটা কী বের করে দেখাল।—এই যে বাবু আলো জ্বালার কাজ নয়, আলোর মুখে ঠুলি বাঁধার কাজ পেয়েছি এখন। বিলেক-আউটের কাজ। মাইনে বেড়েছে, তার ওপর উপরি আছে—মাগ্‌গী ভাতা।

বলে খলখল করে হাসল বলরাম।

না, আর বুঝি থাকা যায় না এ শহরে। দলে দলে লোক পালাচ্ছে আবার। সোনার দাম বাড়ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। চালের দাম, চিনির দাম। শুধু কি তাই?

মেসের বাসিন্দা অনেকেই চলে গিয়েছিল, দু-চারজন যাও বা ছিল সাহসে ভর করে, চাকরির দায়ে, টাকার লোভে, তারাও মোটঘাট বেঁধে সরে পড়ছে একে একে।

সকালে উঠেই মন বিগড়ে গেল তিমিরের, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে।

এ কী চা? যেমন দুর্গন্ধ, তেমনি রঙ।

ঠাকুর মুখ কাচুমাচু করে বললে, চিনি তো বাবু বাজারে কোথাও মেলে না।

তিমির ক্ষিপ্ত হয়ে বললে, এতদিন পাচ্ছিলে, আর রাতারাতি সব চিনি উধাও হয়ে গেল?

ঠাকুর হাসল।—আজ্ঞে বাবু, চিনি কি বাজারে মিলত? ওই কেশববাবু ছিলেন, রেলে কাজ করতেন, র‍্যাশন পেতেন তিনি। তাই দিয়ে চলত আমাদের। এখন সব গুড়, চায়ের দোকানেও বাবু তাই।

তাই তো। তিমিরের মনে পড়ল, সেদিন কলেজের পাশের সেই চায়ের দোকানে ঢুকে চা ফেলে রেখেই চলে এসেছিল।

ঠাকুর বললে, চালও আর মিলছে না বাবু।

এদিকে কলেজও বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে, ছাত্রের সংখ্যা দিন-দিনই কমছে। তা হলে আর কলকাতায় থেকে কী হবে? বাবার কাছ থেকেও ফিরে যাবার তাগিদ আসছে রোজ।

প্রতিদিন জিনিসের দাম বাড়ছে তরতর করে। সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে, শুধু দাম কমছে বুঝি মানুষের। পঞ্চাশ কি ষাট টাকা মাইনের লোভে জীবন পণ করে ছুটছে অনেকেই। যুদ্ধে, এ-আর-পিতে, আরও হাজারো চাকরিতে। যাদের কিচ্ছু নেই, বোমাকে বন্দুককে তাদের ভয় নেই। যাদের কিছু আছে তারাই সরে পড়ছে।

তা হলে গ্রামে ফিরে যাওয়াই ভাল।

ঠাকুরকে ডেকে তিমির বললে, আজ আমিও চলে যাব ঠাকুর।

—টিকিট কিনেছেন বাবু?

—না, গিয়ে কিনে নেব।

ঠাকুর হাসল।—আপনি কিছু খবর রাখেন না বাবু, টিকিট মিলছে না। আগে গিয়ে টিকিট কিনে আনুন।

স্তম্ভিত হয়ে গেল তিমির। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, এত ভিড়? না কি, সে যাতে না যায় তারই চেষ্টা করছে ঠাকুর! যাই হোক, নিজে গিয়ে দেখে আসবে স্টেশনে।

বেরিয়ে পড়ল তিমির।

গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় নামল। কিন্তু কই, নিত্যদিনের মতই লোকজন চলেছে, ট্রামে বাসে তেমনি ভিড়। কোথাও কোন ব্যতিক্রম আছে বলে তো মনে হয় না।

হাওড়া স্টেশনের একটা বাস আসতেই ভুল ভাঙল তিমিরের। সত্যিই তো, এত ভিড় কখনও দেখেছে কি এর আগে? না কি এও ওর মনের ভুল?

পর পর কয়েকটা বাস ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠেলাঠেলি করে কোনরকমে উঠে পড়ল একটা বাসে।

স্টেশন-প্লাটফর্মে এসেই চমকে উঠল তিমির। এ কী অবস্থা?

সমস্ত প্লাটফর্মটার চেহারাই যেন বদলে গেছে, চেনা যায় না লোকের ভিড়ে। একটা উইঢিবি ভেঙে দিলে চক্ষুহীন উইগুলো যেমন দিক্‌বিদিকে ছোটাছুটি করবার চেষ্টা করে এ ওর ঘাড়ে পড়ে তেমনি অবস্থা। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, সেই রাত্রেই নাকি জাপানীরা বোমা ফেলবে। তাই পালাবার চেষ্টা করছে সকলে। মানুষের চেয়ে মালপত্রই যেন বেশী। কেউ কিছু ফেলে যেতে রাজী নয়।

আশ্চর্য মানুষের মন! প্রাণের চেয়েও দামী বুঝি তার সম্পদ! দরিদ্রতম লোকগুলিও হাঁড়ি-কড়াই, বাসনপত্র, চটের থলিটা অবধি সঙ্গে নিয়েছে। একটা গোয়ালার দল চলেছে কাঁধে বিছানাপত্র, হাতে বালতি ঝুলিয়ে। গরুগুলো কী করল? খাটালে রেখে যাচ্ছে, না কি বেচে দিয়েছে কসাইদের কাছে?

ভিড় ঠেলে ঠেলে কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তিমির, হঠাৎ কান্না শুনে ফিরে তাকাল।

একটা বিপুল চেহারার মারোয়াড়ী ভিড়ের মাঝখানেই বসে পড়ে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদছে আর কপাল চাপড়াচ্ছে। ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে সোনা কিনেছিল লোকটা, একটা হাঁড়িতে রেখে ওপরে কয়েকটা লাড্ডু দিয়ে চাপা দিয়েছিল চোর ডাকাতের নজর এড়াতে। কুলিটা কোন্ ফাঁকে সেটা নিয়ে পালিয়েছে।

সে কা কান্না লোকটার! তার বউ ছেলেমেয়েও কাঁদতে শুরু করেছে চিৎকার করে। আশেপাশের লোকগুলো শুনছে আর হাসাহাসি করছে।

হঠাৎ তিমিরের মনে হল, না, ভয় পেয়ে পালাচ্ছে না কেউ। কেউ ভয় পায় নি এরা। আসলে সব-কিছুর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে মানুষগুলো। নিজের ওপর, মনুষ্যত্বের ওপর, গবর্ণমেণ্টের ওপর, দেশের ওপর।

হ্যাঁ, দেশের ওপরও আস্থা হারিয়ে ফেলছে, দেশনেতাদের ওপরও। এখনও কেন শেষ যুদ্ধের জন্যে, স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্যে ডাক দিচ্ছেন না গান্ধীজী! অথচ প্রতিদিনই উষ্মা বাড়ছে সারা দেশের, সহ্যশক্তি যেন ভেঙে পড়ছে।

ভিড়ের চাপে একটু একটু করে এগোতে এগোতে কখন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল তিমির।

হঠাৎ ডাক শুনে ফিরে তাকাল।

—তিমির! তিমির না?

দেখেই চিনতে পারল তিমির।

প্রকাশবাবু? হ্যাঁ, প্রকাশবাবুই। কিন্তু এ-কটা বছরে এত বুড়ো হয়ে গেছেন? সব চুল সাদা হয়ে গেছে এই কটা বছরের মধ্যে?

তিমির এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।—জ্যাঠামশাই, আপনি?

প্রকাশবাবুকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখাল। পরমুহূর্তেই যেন স্বস্তিবোধ করলেন তিমিরকে দেখতে পেয়ে।

বললেন, টিকিট তো কাটতে পারছি না বাবা, এই ভিড়ে···

তিমির বললে, আপনি এলেন কেন, প্রতুলদা কিংবা অতুলদাকে পাঠালেই তো পারতেন।

চোখ ছলছল করে উঠল প্রকাশবাবুর।—তারা তো বাবা এখানে নেই, তারা ছুটি পায় নি, আসবে কী করে?

তিমিরের ইচ্ছে হল একবার জিগ্যেস করে, রত্না কোথায়? রত্না কেমন আছে? কিন্তু পারল না।

একটু ইতস্তত করে বললে, কোথাকার টিকিট? দিন দেখি চেষ্টা করি।

প্রকাশবাবু টাকা বের করতে করতে হঠাৎ বললেন, দাঁড়াও, তোমাকে যখন পেয়েই গেছি···

সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল তিমির।

প্রকাশবাবুকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখাল আবার। এদিক ওদিক তাকালেন, কী যেন ভাবলেন, কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, তোমার কাছে আর কী লুকোব বাবা, বলছিলাম কী…

আমতা আমতা করে বললেন, ছেলেরা তো সব মেসে হোটেলে থাকে বাইরে বাইরে। সেখানে বাড়িটাড়ি পাওয়া যায় না এখন—তা কোথায় যে যাব ঠিক করে উঠতে পারি নি এখনও, .ভাবছিলাম আগে তো যাই পুরীটুরী কোথাও। তারপব নয় দেখে নেব…

তিমিব বিস্মিত হয়ে বললে, সেখানেই কি বাড়ি পাবেন এখন। দেশে চলে যাচ্ছেন না কেন তার চেয়ে?

প্রকাশবাবু অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, দেশ যে আমাদের নেই তিমির। আগে কি ছাই পাড়াগাঁয়ের দাম বুঝেছি, যা-কিছু ছিল সব ঢেলে কলকাতায় বাড়িখানা করেছিলাম, দেশে-গাঁয়ে ত আমাদের কিছু নেই। কোথায় যাব বল তো?

স্তম্ভিত হয়ে গেল তিমির। ঠিক এ-কথাটা শোনবার জন্যে ও যেন তৈবি ছিল না। দেশ-গাঁয়ে তো আমাদের কিছু নেই! তিমিরের ধারণাই ছিল না এমন মানুষও আছে, যার দেশ-গাঁ নেই। কলকাতাতেই যাদের জন্ম, কলকাতাতেই মানুষ। তাই, একদিন এরাই বুঝি তাকে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে বলে ঠাট্টা করত।

প্রথম আলাপের দিনে মালাব কাছে শুনেছিল তিমির। শুনেছিল, রত্না নাকি তাকে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে বলে ঠাট্টা করে। অরুণাভর কাছেও এই বক্রোক্তি শুনতে হয়েছিল বহুবার।

আজ অনিচ্ছাকৃতভাবেই যেন প্রতিশোধের অস্ত্র হাতে পেয়ে গেছে তিমির। সমস্ত মন তার কৌতুকে আনন্দে একটা হিংসার অট্টহাসে নেচে উঠতে চাইল।

কিন্তু না, প্রকাশবাবু তো কোন দোষ করেন নি।

আজ যদি রত্নাকে ঠিক এমনিভাবে অনুনয় করতে দেখত সে! যদি প্রতিশোধ নিতে পারত! তবে কি রত্নাকে কোনদিন ভালবাসে নি সে, মন দিয়ে মনকে টানে নি? শুধুই ব্যঙ্গের জবাব দিতে চেয়েছিল? উপহাসের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল? আর তাই মিথ্যা প্রেমের অভিনয়ে রত্নাকে ভোলাতে চেয়েছিস সে?

তিমির হঠাৎ প্রশ্ন করল, রত্না কোথায় জ্যাঠামশাই, শ্বশুরবাড়িতে?

প্রকাশবাবুকে কেমন যেন ম্রিয়মান দেখাল। ধীরে ধীরে বললেন, তার তো বিয়ে হয় নি এখনও। রত্না নয়, রানীর বিয়ে দিয়েছি। তোমার তো ঠিকানা জানতাম না, তাই নেমন্তন্ন করতে পারি নি।

চমকে উঠল তিমির। বিয়ে হয় নি রত্নার? কেন, কেন বিয়ে হয় নি? তবে কি···

একটা বীভৎস অন্ধকারের জাল যেন রহস্যের বিদ্যুতে আরও গভীর হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই অস্বস্তি বোধ করল তিমির। নির্বোধের মত এ কী প্রশ্ন করে বসেছে সে? রত্নার বিয়ের খবর তো তার জানবার কথা নয়। যাক, প্রকাশবাবু কিছু সন্দেহ করেন নি।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কাউণ্টারের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে তিমির আবার প্রশ্ন করলে, তা হলে কোথাকার টিকিট কাটব?

প্রকাশবাবুকে কেমন যেন চিন্তিত দেখাল, কেমন যেন অপ্রতিভ। বললেন, তুমি বলছ, বাইরে কোথাও এখন ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে না। তা হলে কী করা যায় বল তো?

প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ার যোগাড় করলেন প্রকাশবাবু।—আমাদের যে যাবার জায়গা নেই তিমির, কলকাতা ছেড়ে যে কোথাও যাবার জায়গা নেই।

তাঁর সেই অসহায় কণ্ঠস্বর যেন তিমিরের বুকে এসে লাগল।

বললে, তার চেয়ে আমাদের গাঁয়ে চলুন জ্যাঠামশাই।

—তোমাদের গাঁয়ে? বন্যায় ভাসতে ভাসতে এক টুকরো খড় ধরতে পারার মত অনন্দে চকচক করে উঠল তাঁর চোখ ছুটো। উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, দেবে? একটুখানি জায়গা, দেবে আমাদের থাকবার মত একটু জায়গা?

তিমির হাসল।

বললে, গ্রামের বাড়ি, আমরা যে-ভাবে থাকি মাটির ঘরে, আপনাদের যদি অসুবিধে না হয়।

প্রকাশবাবু হাতে স্বর্গ পেলেন।—তবে তাই চল বাবা, নিয়ে চল আমাদের। অসুবিধের কথা বলছ! প্রাণ আগে, না সুবিধে অসুবিধে আগে! তা ছাড়া, আমরাও তো একদিন গ্রামের মানুষই ছিলাম তিমির, সকলেই তো গ্রামের মানুষ, কলকাতায় এসে চেহারাটাই বদলে যায়, মন তো বদলায় না।

তিমির আর অপেক্ষা করল না, ভিড় ঠেলে অন্য কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেল। আর ঘণ্টাখানেক পরে টিকিট কেটে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে মনে মনে হাসল সে। তিমিরের হঠাৎ মনে হল কলকাতাকে, কলকাতার মানুষগুলোকে সে যেমন ভালবেসে ফেলেছে, তেমনি বুঝি মনে মনে ঘৃণাও করেছে। তা না হলে প্রকাশবাবুর এই অসহায় অবস্থা দেখে কৌতুক বোধ করছে কেন সে, তাঁর এই অকপট স্বীকৃতিতে প্রতিশোধের উল্লাস জাগছে কেন তার মনে?

প্রথম যেদিন গ্রাম থেকে এই শহরে এসেছিল সে, মনে পড়ল, মালার সেই উপহাস। গ্যাসবাতি কোন্‌গুলো চিনতে পারে নি সে, ট্রাম দেখে নি তার আগে। আর তাই মালা তাকে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে বলে ঠাট্টা করেছিল।

তিমিরের মনে আছে, পদে পদে, দিনে দিনে কলকাতার মানুষের কাছে, এমন কি রত্নার কাছেও কী লাঞ্ছনাই না ভোগ করেছে সে!

মনে পড়ল সেই দিনটার কথা, যে-দিন রত্না আর মঞ্জুলিকার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। ইংরেজী ছবিটার এক বর্ণও বুঝতে পারে নি তিমির, হয়তো ওরাও কেউ বোঝে নি। তবু সেই কথাটা স্পষ্ট করে মঞ্জুলিকার সামনে বলে ফেলায় রত্না রেগে গিয়েছিল সেদিন। কেন, তা কি বোঝে না তিমির! ঠিকই বোঝে। বুঝেছিল। অর্থাৎ তিমির যেমন ভাবে। কলকাতাকে মনে মনে ঘৃণা করেও কী এক নেশায় ভালবেসে ফেলেছে, তেমনি রত্নাও তিমিরের মনকে ভিতরে ভিতরে ঘৃণা করে, কিন্তু ঘৃণা করেও কী এক অবোধ্য নেশায় বুঝি ভালবেসেছিল।

আর সেই ঘৃণার উপহাসের জবাব দিতে পেরেছে ভেবে উল্লসিত বোধ করল তিমির। তারপর হঠাৎ এক সময় কেমন ভয়-ভয় করে উঠল তার।

হঠাৎ মনে হল এ-ভাবে বাবাকে মাকে না জানিয়ে কোন অনুমতির অপেক্ষা না করে রত্নাদের নিয়ে যাওয়া কি উচিত হচ্ছে তার? কেন নয়? নিজের মনকেই প্রবোধ দিল সে, মানুষের বিপদে সাহায্য করতে হলে ভেবেচিন্তে পা ফেলার কথা কে ভাবতে শিখিয়েছে তাকে? এই শহর, এই শহর।

প্রকাশবাবুর পিছনে পিছনে কাশী বোস লেনের বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তিমির, ত্বরুত্বরু বুকে ভয় আর আনন্দ।

রত্না। রত্নাকে দেখতে পাবে হয়তো, হয়তো কথা বলতে পাবে।

কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝি এসে দরজা খুলে দিল।

প্রকাশবাবুর পিছনে পিছনে বসবার ঘরে ঢুকল তিমির, তারপর চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছিল।

প্রকাশবাবু বললেন, ও কি, এস এস, ভেতরে চল, তুমি হলে ঘরের ছেলে···

কথাটার মধ্যে কেমন যেন তোষামোদের গন্ধ পেল তিমির। কেমন যেন উপকারের মূল্য দেওয়ার আগ্রহ।

এই কাশী বোস লেনেই মালাদের বাড়িতে যখন থাকত সে, তখনও দু-চারদিন কাজে-অকাজে তাকে আসতে হয়েছে এ বাড়িতে। কখনও মালাদের সঙ্গে, কখনও বা একাই।

না, তখনও ভাল ব্যবহারই পেয়েছে সে সকলের কাছে। রত্নার মা স্নেহ করেন নি এমন নয়। কিন্তু কই, তাকে ঘরের ছেলে তো ভাবে নি কেউ! কোথায় যেন একটা দূরত্ব রেখে রেখে চলেছিল তখন।

সিঁড়ি থেকেই চিৎকার করতে করতে ওপরে উঠলেন প্রকাশবাবু। —রত্না, ছোট বউমা! দেখে যাও কে এসেছে।

সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত ছুটে এসেই থমকে ঘোমটা টেনে পাশে সরে দাঁড়াল সুলতা।

প্রকাশবাবু এক মুখ হেসে বললেন, চিনতে পারছ না? ওই যে

তেরো নম্বরে থাকত মালারা, তার ভাই—সেই তিমির। কতবার এসেছে এখানে।"

" একটু অস্পষ্টভাবে হয়তো মনে পড়ল সুলতার। মুখের ভাবে তাই মনে হল তিমিরের। কিন্তু ক্ষতি নেই তাতে, সুলতা-বউদি চিনতে না পারুক ক্ষতি নেই। রত্না চিনতে পারবে তো? সে রত্নাকে চিনতে পারবে তো?

প্রকাশবাবু দোতলার ঘরটিতে নিয়ে এসে বসালেন তিমিরকে।

তারপর হাঁকডাক চিৎকার করে সকলকে ডেকে আনলেন। সকলেই এল। ছোট বউমা, রত্নার মা, আরও বাচ্চা বাচ্চা কয়েকটি ছেলেমেয়ে। না, বড় বউমা নেই। বাপের বাড়ি গেছে সে। আর রানী আছে জামাইয়ের কাছে। কিন্তু রত্না? রত্না কোথায় গেল?

এত হাঁকডাক, এত চিৎকার কি আর কানে যায় নি তার! গিয়েছে। ছুটতে ছুটতে এসেও ছিল সে, তারপর জানলা থেকে তিমিরকে দেখতে পেয়েই বিস্ময়ে আতঙ্কে রাগে পালিয়ে গিয়ে ঘরে কপাট দিয়েছে। না, আসবে না সে। দেখা করবে না, দেখা দেবে না তিমিরকে। যা শেষ হয়ে গেছে তা একেবারেই শেষ হয়ে যাক। রত্নার জীবনকে যে এভাবে কানা গলির পথিকে রূপান্তরিত করেছে তার কাছে আর পথ জানতে চাইবে না রত্না।

কেন এসেছে তিমির? এতদিন পরে বুঝি বা অনুশোচনা হয়েছে, তাই খুঁজে খুঁজে এসেছে আবার। কিংবা খোঁজ নিতেই এসেছে শুধু, আর কিছু নয়। না কি—

হঠাৎ সমস্ত শরীর যেন জ্বালা করে উঠল রত্নার। তাই হবে, নিশ্চয় বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছে তিমির, তাকে উপহাস করবার জন্যই খবরটা বয়ে এনেছে।

কিন্তু না, রত্না না গেলে কি চলে? অভদ্রতা মনে হবে।

রত্নার মা নিভাননী দেবী নিজেই এলেন।—রত্না, কপাট খোল্, কে এসেছে দেখবি আয়। খোল্ কপাট।

রত্না যে জানে কে এসেছে, সে যে ইচ্ছে করেই কপাট বন্ধ করেছে তা তো নিভাননী জানেন না। তাই কপাটে ধাক্কা দিলেন আবার।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল রত্না।—কী? বিরক্ত করছ কেন?

নিভাননী এক মুখ হাসি ছিটিয়ে বললেন, আয়, আয়, তিমির এসেছে, সেই মালার পিসতুতো ভাই। সে এসেছে—তাদের গাঁয়েই নিয়ে যাবে আমাদের, আর বোমা খেয়ে মরতে হবে না।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল রত্না। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে মায়ের পিছনে পিছনে।

ছোট বউদি সুলতাও ছুটে এল।—আমি চা করতে যাচ্ছি ঠাকুরঝি, তুমি এসে নিয়ে যেয়ো।

নিভাননী ঝিকে পয়সা দিলেন কাছের দোকান থেকে মিষ্টি আনবার জন্যে। বললেন, রত্না, মিষ্টি এলে তিমিরকে দিয়ে আসিস।

প্রকাশবাবু ডাকলেন, রত্না, রত্না!

প্রত্যেকটি লোকের ব্যবহার, কথাবার্তা যেন অত্যন্ত কুৎসিত মনে হল রত্নার।

বোমার ভয় থেকে পালিয়ে বাঁচবার একটা আশ্রয় পেয়েছে বলে বাড়ির সবাই যেন তিমিরের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিতে চায়।

কই, এর আগেও তো তিমির এসেছে এ-বাড়িতে। এসে বসে থেকেছে নীচের বৈঠকখানা ঘরে। কেউ তো সেদিন রত্নাকে ডাকে নি। বলে নি, চা দিয়ে আয় তিমিরকে। বরং কারণে অকারণে মালাদের বাড়ি গেলে ধমক দিয়েছে মা, বাধা দিয়েছে।

বলেছে, বড় হয়েছিস, হুটহুট করে মালাদের বাড়ি যাস কেন? বলেছে, তিমিরের সঙ্গে অত গল্প কিসের ?

এ-সব ধমকে কান দেয় নি রত্না সেদিন। কিন্তু আজ ঘটা করে সেই মানুষটাকেই এত আদর-আপ্যায়ন কেন ?

তবু মায়ের কথা, ছোটবউদির কথা না মেনে উপায় নেই। চা আর মিষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকল রত্না, টুলটার ওপর রাখল।

চোখ তুলে তাকাল তিমির। চোখ খুলে স্পষ্ট করে তাকাল রত্না। দুজনেই তারপর চোখ নামালে অস্বস্তিতে।

প্রকাশবাবু উঠে পড়লেন।—দাঁড়াও, টাইমটেবলটা নিয়ে আসি।

নিভাননীও উঠে দাঁড়ালেন।—তুমি বাবা এখানেই খেয়ে যাবে। খেয়েদেয়ে জিনিসপত্তর নিয়ে এস তোমার···

রত্না তখনও দাঁড়িয়ে রইল, অপেক্ষা করল।

ঘর থেকে নিভাননীও বেরিয়ে গেলেন স্নুলতাকে রান্নার নির্দেশ দেবার জন্যে। না কি ওরা ইচ্ছে করেই রত্নাকে এই অস্বস্তির মধ্যে ফেলে গেল !

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রত্না, মাথা নীচু করে। সিমেণ্টের ওপর পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ ঘষতে শুরু করল।

কিছুই কি বলবে না তিমির ? কিছুই কি তার বলবার নেই ?

আছে, অনেক কিছু বলবার, অনেক কিছু প্রশ্ন করবার। সেই রহস্যের ঘরের তালা খুলতে চায় তিমির।

তবু সে পারল না চোখ তুলে তাকাতে, মুখ ফুটে প্রশ্ন করতে।

মাথা নীচু করে চায়ের পেয়ালায় বার কয়েক চুমুক দিল শুধু।

রত্নাই প্রথম কথা বললে। অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যাবার পর রত্না হঠাৎ বলে উঠল, ভেবেছিলাম আর বুঝি দেখা হবে না।

অতি সাধারণ, তুচ্ছ একটা কথা। কথা বলার জন্যেই যেন কিছু একটা বলা। তবু দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।

জবাব দিল না তিমির। কী বলবে সে এ দীর্ঘশ্বাসের উত্তরে। কিন্তু একটা কিছু না বলতে পারলে কেমন যেন অস্বস্তি।

চায়ের পেয়ালায় আবার চুমুক দিল তিমির, কিংবা চুমুক দেবার ভান করে মাথা নীচু করল, চোখ নামাল। রত্নাব সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যাওয়াকেও যেন ভয় তার।

আর এই চোখ নীচু করার সুযোগে ফিসফিস করে তিমির বললে, এ ভাবে তোমাকে দেখব আবার, ভাবি নি কোনদিন।

ম্লান হাসি জ্বলে উঠেই নিবে গেল রত্নার ঠোঁটের কোণে।

বলল সে, ধীরে ধীরে বলল, সে রত্না বেঁচে নেই।

এর চেয়ে স্পষ্ট কোন অভিযোগ শুনলে যেন বেঁচে যেত তিমির কিন্তু এ যেন অভিযোগ নয়, নিঃশব্দ একটা আতঙ্ক।

কোন কথা বলতে পারল না তিমির। কথা খুঁজে পেল না।

প্রাণ ভয়ে সারা কলকাতা যেন ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে।'
মিনিটে মিনিটে গুজব ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। জাপানীরা নাকি এসে গেছে ঘরের দরজায়! নৃশংস তাদের অত্যাচার। বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে নাকি শত্রুপক্ষের সাবমেরিন ঘুরে বেড়াচ্ছে! যে-কোন মুহূর্তে নাকি লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্য বন্যার বেগে এগিয়ে আসতে পারে। পঙ্গপালের মত মুহূর্ত সময়ে নাকি সারা আকাশ ছেয়ে ফেলতে পারে শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান।

শত্রুপক্ষ? হাসে অনেকে। জাপানী আবার শত্রু কী করে হল? সে তো ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু। ইংরেজ ভারতের শত্রু, আর জাপান ইংরেজের। এই সরল গাণিতিক নিয়মে জাপান নাকি ভারতের বন্ধু।

কেউ কেউ বলে, সুভাষ বোস আছে না, ভয় কিসের?

মুখে ভয় কিসের বললেও ভয় সকলেরই। কী জানি কখন কী ঘটে যায়! সুভাষ বোসের খবর তো গুজব শুধু। সত্যি কি স্বাধীনতার জন্য কিছু করতে পারবেন তিনি? কিছু করছেন? তা হলে খবরের কাগজে এতটুকু খবরও নেই কেন তাঁর? গান্ধীজীর আন্দোলনের হুমকি ছাপতে যারা ভয় পায় না, কংগ্রেসের খবর, ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের খবর যারা ছাপছে প্রতিদিন, সুভাষ বোসের কোন খবরই ছাপছে না কেন তারা! সব বাজে গুজব, সব মিথ্যে রটনা।

হাজারে হাজারে লোক তাই ছুটে চলেছে স্টেশনের দিকে। বাড়ি ঘর ফেলে রেখে পালাচ্ছে ধনী ব্যবসায়ীর দল, জলের দরে বিক্রি করে দিচ্ছে আসবাবপত্র, জমি, বাড়ি।

সবকিছুর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে মানুষ, নিজের ওপরও। শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ।

তিমির দেখে আর হাসে। সেও পালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভয়ে নয়। মৃত্যু? সত্যিই মানুষ মরতে পারে, সে নিজে মারা যেতে পারে, এ-কথা যেন ভাবতেও পারে না।

প্রবোধ দেয় সে প্রকাশবাবুকে। বলে, মিথ্যে ভয় আপনাদের। চাল চিনি পাওয়া যায় না, মেসে ঠাকুর চাকর নেই, নানান অসুবিধে, তাই চলে যাচ্ছে সকলে; আমিও যেতে চাই সেই জন্যেই। কিন্তু জীবনের ভয়ে কেন পালাবে মানুষ?

প্রকাশবাবু হাসেন।—তোমার বয়সের গুণ ওটা তিমির। ও-বয়সে মৃত্যুর কথা ভাবা যায় না। আমার বয়সে এসে দেখবে, জীবনের কথাই ভাবা যায় না।

নিভাননীও হাসেন তিমিরের কথা শুনে। হাসেন, দু-একটা টীকা-টিপ্পনী দেন, আর জিনিসপত্তর গোছগাছ করেন।

মাত্র কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছিলেন প্রকাশবাবু। শরীর স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে। স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূকে গ্রামের আশ্রয়ে রেখে আবার ফিরে আসবেন তিনি। বোমার ভয়কে তুচ্ছ করেই আসবেন। কারণ না এলেও যে অন্য এক মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে যাবে।

চাকরির জন্যে জীবনও বুঝি তুচ্ছ করা যায়! ভাবে তিমির। সমস্ত জাতটার ওপর মনে মনে বিষিয়ে ওঠে। সামান্য একটা চাকরির মোহে মানুষ শুধু যে অন্তরের আবেগকে উপেক্ষা করে ইংরেজ শাসকের পক্ষে ঢলে পড়েছে তাই নয়, মৃত্যুর ভয়কেও জয় করেছে।

হঠাৎ তিমিরের মনে হল সে নিজেও বুঝি একদিন অনেক ছোট হয়ে গিয়েছিল। অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল একটা চাকরির

জন্যে। রত্নাকে পাবার আশায় চাকরি চেয়েছিল ব্রজবাবুর কাছে। কিন্তু রত্নার জীবনের সঙ্গে আবার যেন জড়িয়ে পড়তে চলেছে সে।

নিজেই একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে এল তিমির। দু টাকা ভাড়ার জায়গায় দশ টাকা ভাড়া হেঁকেছে কোচোয়ান। এই তো সুযোগ তার।

পৃথিবীর নিয়মই বুঝি এই।

তিমিরের মনে পড়ল, প্রথম যেদিন ছোটমামার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল সে, স্টেশনে নেমে কী বিরক্তই না হয়েছিল রিক্‌শাওয়ালা কোচোয়ান আর ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের জ্বালায়! ট্রেন থেকে নামতে-না-নামতে ছেঁকে ধরেছিল। এক পা করে এগিয়েছে আর একজন করে জিগ্যেস করেছে, কোথায় যাবেন?

সেদিন ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানটা নিজেই একটা কুলির খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছিল। নিজেই সে তিমিরের বাক্স বেডিং কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ফিটন অবধি। দু টাকা ভাড়ার জায়গায় দেড় টাকায় রাজী হয়েছিল।

আর আজ দশ টাকার নীচে একটা গাড়িও রাজী হল না। যেন লোক নেবার জন্যে নয়, হাওয়া খাবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়েছে, এমনি ভাব দেখাচ্ছে তারা।

আরও বিস্মিত হল তিমির, মেসের কাছে এসে। কোচোয়ানটা তার উঁচু আসন থেকে নামল না। মালপত্র যা নেবার তা তিমিরকেই তুলে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে আর কি।

বাক্স বিছানা নিয়ে মেসের ঠাকুরকে বিদায় জানিয়ে কাশী বোস লেনে এসে হাজির হল যখন, তখন প্রকাশবাবু ট্যাক্সি ডেকে এনেছেন দু-দুটো।

তিমিরের ঘোড়ার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে কিন্তু ফিক

করে হেসে ফেলেছিল ছোটবউ স্নুলতা। কিন্তু পরক্ষণেই হাসি চাপল সে।

আর প্রকাশবাবু বললেন, তোমার গাড়ি বিদেয় করে দাও তিমির, এই ট্যাক্সিতেই জায়গা হবে।

বাধ্য হয়েই মালপত্র তুলে নিয়ে কোচোয়ানটাকে বিদায় দিল সে।

তারপর ট্যাক্সি ছুটল।

সেই—সেই প্রথম যেদিন কলকাতায় এসেছিল সে, মনে অনেক রোমাঞ্চ আর বুকে অনেক ভয় নিয়ে।

আশ্চর্য! আজ আর কোন কিছুই দেখবার নেই চোখ চেয়ে। কোন ঔৎসুক্য নেই, আগ্রহ নেই। সব বিস্ময়ের দেয়াল যেন ভেঙে পড়েছে আজ।

মানুষে টানা ঠ্যালাগাড়ি দেখে সেদিন চমকে উঠেছিল তিমির। আজ আর চমক নেই, বিস্ময় নেই। চোখে-ঠুলি-আঁটা আলোক-স্তম্ভের সারি দাঁড়িয়ে আছে নীরব দর্শকের মত। কটাক্ষে বিদ্রূপের হাসি যেন। হাসছে, হাসছে, সারা শহর আজ হাসছে, বিদ্রূপের হাসি। না কি কান্নার?

—কে জানে তিমির, আর কোনদিন এখানে ফিরব কিনা! হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন প্রকাশবাবু ট্যাক্সিতে ওঠার আগে।

তন্ময়তা কেটে গেল তিমিরের। সত্যি নাকি? সত্যি আর কোনদিন ফিরবে না সে এ শহরে? এ জীবন ফিরে পাবে না?

কেমন একটা হতাশার ভাব জেগে উঠল।

এই উঁচু-নীচু জলজমা পথ, পাথর নড়বড় করে, পা দিলেই জল ছিটকে এসে কাপড়ে লাগে, এই নোংরা শহর, এই মনুষ্যত্বহীন কদর্য নোংরামির জীবনকে ছেড়ে যেতে হবে জেনে হঠাৎ এমন বেদনা বোধ কেন তিমিরের?

এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি।

ঠুনঠুন করে এগিয়ে চলেছে নড়বড়ে ট্রামগুলো। ঠ্যালাগাড়ির পিছনে পিছনে চলেছে। ঠিক এই শহরটার মত, ঠিক এই শহরের মানুষগুলোর জীবনের মত। অসীম এক শক্তির বেগ যেন খোঁড়া হয়ে গেছে স্বার্থের শ্লথগতির কাছে। এই শহর—যার পর্যাপ্ত আলোর চোখে অন্ধের ঠুলি, যার বিদ্যুৎগতির সামনে ঠ্যালাগাড়ির ব্যঙ্গ, যার এত বড় আকাশে শুধুই ধোঁয়া, ধোঁয়া আর কুয়াশা। এই শহরের মানুষগুলোর জীবনও বুঝি এমনি আশায় উজ্জ্বল আর আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে।

নতুন ব্রিজের সেই উর্ধ্ববাহু দৈত্যের মত ইস্পাতের কঙ্কালটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। দৈত্যের দম্ভ নয়, উন্মত্তের হাহাকার যেন!

—কে জানে তিমির, আর কোনদিন ফিরব কিনা!

প্রকাশবাবুর কথাটা আবার কানের কাছে বেজে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন যেন বিষাদে ভরে গেল তিমিরের।

সেই প্রথম যেদিন রত্নাকে হারাবার ভয়ে সারা মন তার হাহাকার করে উঠেছিল, তেমনি উপায়হীন হতাশা যেন।

তবে কি সত্যিই সে এ-শহরকে ভালবেসে ফেলেছে? এই ঘৃণার শহরকে?

সমস্ত মন উদাস হয়ে গেল তিমিরের। কেন এই বেদানাবোধ, কেন এই ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা? তবে কি···

মাস্টারমশাইকে হঠাৎ মনে পড়ে গেল তিমিরের।

সারাটা জীবন কিছু না পেয়ে, বার বার বঞ্চিত হয়েও কেন তিনি পড়ে থাকতেন এই শহরের অন্ধকারে? কেন, কেন? সেদিন উত্তর খুঁজে পায় নি তিমির। আজ মনে হল, সত্যিই বুঝি এ শহরের কোথায় কি এক বিচিত্র নেশা আছে! ভালবাসার

নেশা। যে নেশার ঘোরে জুতোর কাঁটাকে সহ্য করেও দীর্ঘপথ হেঁটে যেতে হয়।

সেই নিরক্ষর মুচিটার কথা মনে পড়ল।

আর বলরামের কথা।—আলো জ্বেলে পেট ভরল না বাবু, আলোর চোখে ঠুলি বেঁধে পেট ভরছে।

আলো জ্বেলে বুঝি পেট ভরবে না কারও, জীবনের খিদে মিটবে না। আলোর চোখে ঠুলি বেঁধে মানুষকে বাঁচতে হবে।

এই শহর আলোর চোখে ঠুলি বাঁধতে শিখিয়েছে সকলকে, শেখাবে। তিমির নিজেও বুঝি বদলে গেছে, বদলে গেছে বলেই ভালবেসেছে এ শহরকে।

গঙ্গা, পণ্টুন ব্রিজ, স্টীমার, নৌকো।

আঃ, এতক্ষণে মিষ্টি ঠাণ্ডা ফাঁকা হাওয়া এল এক-দমকা। ক্লান্ত, বড় বেশী ক্লান্তি লাগছে তিমিরের। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। ঘুম, চিন্তাহীন নিঃশব্দ শান্ত ঘুম।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা তো পথ। কোন রকমে ট্রেনের কামরায় একটু জায়গা করে নিতে পারলেই শান্তি।

ভিড় ঠেলে একটা কামরায় উঠে পড়ল সকলে। সারা ট্রেন মিলিটারী-পোশাক-পরা লোকে ভর্তি। আমেরিকান আর ব্রিটিশ সৈন্য, চীনে সৈন্য, ভারতীয় সৈন্য। খাকী পোশাকে কিছু কিছু বাঙালীও রয়েছে তাদের মধ্যে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সাদাসিধে ধুতি-পাঞ্জাবি, কিংবা কোট-প্যাণ্টেও এই সমবয়সী বাঙালী ছেলেগুলোকে যত আপনার জন মনে হত, খাকী পোশাক পরেছে বলেই তাদের যেন কত দূরের মানুষ মনে হচ্ছে। একটা ভয়ঙ্কর কিছু, যেন বিশ্বাস করা যায় না।

একটা কামরায় মাত্র তিনটি বাঙালী ছেলে বসে ছিল খাকী পোশাক পরে। প্রকাশবাবুকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেড়াতে দেখে, অর্থাৎ প্রকাশবাবুর সঙ্গে রত্না, সুলতা, রত্নার মাকে বিব্রত হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে তারা ডাকল প্রকাশবাবুকে।

বললে, এ কামরায় উঠতে পারেন আপনারা, জায়গা আছে।

বাংলা কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন প্রকাশবাবু, হয়তো উঠেও পড়তেন, কিন্তু সুলতা বাধা দিল। ফিসফিস করে বললে, না বাবা, অন্য কামরায় চলুন।

রত্নার মাও সায় দিলেন ছোটবউয়ের কথায়। মুখের ভাষার চেয়ে তাদের গায়ের উর্দিটাই যেন বড়। ও পোশাকের তলায় যেন মনুষ্যত্ব থাকতে পারে না। ইংরেজ টমি আর বাঙালী স্যাপারে বুঝি পার্থক্য নেই কোন। এক জাত সব, একই রকম অনাস্থার পাত্র।

আসলে ওই খাকী পোশাকটাকেই যেন ভয় সকলের। বীভৎস চেহারার কোন দৈত্যকে দেখেও মানুষ এত ভয় পেত না যেন।

তাই তাদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেই এগিয়ে গেলেন প্রকাশবাবু, উঠলেন একটা ভিড়ে-ঠাসা কামরায়।

তারপর ট্রেন ছাড়তে একটু বসবার জায়গাও পেয়ে গেল সবাই।

কিন্তু ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল তিমিরের। এতক্ষণ তাড়াহুড়োর মধ্যে যে-কথাটা মনে আসে নি, সেই আতঙ্কটা আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে।

প্রকাশবাবুর বিব্রত অবস্থা দেখে, তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে এ কী করে বসেছে সে! হঠাৎ এই একটা পরিবারকে তাদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে কোথায় থাকতে দেবে, কী ব্যবস্থা করবে? তার বাবা-মাকে বিব্রত করা হবে। বাবা কী ভাববেন? রত্নার সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে সাধারণ নয় মোটেই, তা কি কারও চোখে পড়বে না?

মনে মনে উপায় ভাবছিল তিমির। আর চিন্তায় মাঝে মাঝে বাধা পড়ছিল প্রকাশবাবুর প্রশ্নে: ছোট লাইনের ট্রেন কখন পাওয়া যায়, কোন্ স্টেশনে নামতে হবে, গ্রাম কতদূর?

সুলতার ভারি মজা।—বেশ হবে কিন্তু ঠাকুরঝি, ছোট গাড়িতে কখনও উঠি নি, এবার শখ মিটবে।

রত্না হাসবার চেষ্টা করে সুলতা-বউদির কথা শুনে।

তিমির কিন্তু হাসতে পারে না। অদ্ভুত একটা দুশ্চিন্তা তার মাথায়। দুশ্চিন্তা নয়, দুঃসহ একটা বোঝা যেন। কী করবে সে এদের নিয়ে, কোথায় নামাবে? হঠাৎ একবার মনে হল তার, কোন একটা স্টেশনে নেমে পালালে কেমন হয়? সব ঝামেলা চুকে যায়, সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কী আর হবে? তাকে ছোট ভাববেন হয়তো এঁরা। কিন্তু তা ভাবলেই বা দোষ কী, আর

তো কখনও দেখা হবে না। পরক্ষণেই নিজের মনেই হেসে ফেলল তিমির। ছি-ছি, এ সব কী ভাবছে সে!

সুলতা তার হাসি লক্ষ্য করল। বললে, কী, হাসছেন যে?

কী আর বলবে তিমির! বলল, ভাবছি কী অবস্থা হবে আপনাদের। অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবেন?

প্রকাশবাবু হাসলেন, দুঃখের হাসি। বললেন, আশ্রয় পেয়েছি, এই যথেষ্ট। এটুকুই বা আজকের দিনে কে দেয় তিমির? দু-ছেলেকে চিঠি লিখে একটা ব্যবস্থা করতে পারলাম না, একটা বাড়ি ভাড়া করতেও পারল না তারা।

সুলতা অভিমানের স্বরে বললে, তাঁদের কী দোষ বাবা, আজকাল বাড়ি তো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বাবাও তো কোথাও কিছু ব্যবস্থা করতে না পেরে মামার বাড়িতে চলে গেলেন।

প্রকাশবাবু মনের রাগ চাপা দিলেন। বললেন, না না, অতুল প্রতুলের দোষ তো বলছি না, সব দোষ আমার কপালের বউ মা। তা না হলে ...

তিমির বাধা দিল। বললে, আমাকেই বা এত পর পর ভাবছেন কেন? নিয়ে যাচ্ছি যখন, ব্যবস্থা হবেই একটা। তবে শহরে থাকা অভ্যাস আপনাদের, অসুবিধে হবে আপনাদের, তাই বলছি।

মুখে এ-কথা বলল বটে, কিন্তু আসল অসুবিধে তো তিমিরের। ওর সব সময়েই মনের মধ্যে আতঙ্ক, বাবা-মা কী ভাববে, কী বলবে! আর কী ব্যবস্থা করবে সে এঁদের!

বড় লাইনের গাড়ি থেকে নেমে ছোট লাইনের গাড়িতে যখন উঠল সকলে, তখন তিমিরের বুক দুরদুর করতে শুরু করেছে। রীতিমত নার্ভাস বোধ করছে সে।

কিন্তু তার মনের মধ্যে যে তোলপাড় চলছে তার কোন খবরই কেউ [illegible] চায় না। প্রকাশবাবুও যেন বেশ হাল্কা সুরে কথা বলতে শুরু করেছেন! আর সুলতার মুখে স্ফূর্তির হাসি।

দুলে দুলে গরুর গাড়ির মত ধীরচালে এগিয়ে চলেছে ট্রেনটা। দু পাশে ধান-জমি। স্টেশনগুলোও হাসি পাবার মত। এত ছোট। ছোট লাইনের ট্রেনের ইঞ্জিনটা দেখে সুলতা আর রত্না হেসে উঠেছিল, ট্রেনের স্পীড দেখে তারা আবার হাসতে শুরু করল।

সুলতা বললে, বেশ মজার গাড়ি, না ঠাকুরঝি! ইচ্ছে হয় চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়, ইচ্ছে হয় উঠে পড়।

রত্নাও আড়চোখে তিমিরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল।

আশ্চর্য, তিমিরও হাসল এ-কথায়। আজ এই ছোট লাইন, ছোট্ট ট্রেন, ক্ষুদে ইঞ্জিন আর ক্ষুদে ক্ষুদে কামরাগুলোকে পুতুলের মত মনে হচ্ছে তিমিরের। চিমে তালে ট্রেনটাকে চলতে দেখে তারও হাসি পাচ্ছে।

অথচ একদিন মালা যখন এই ট্রেন দেখে ঠাট্টা করেছিল, সেই যেবার প্রথম ছোটমামা আর মালা এসেছিল তাদের গাঁয়ে, এসে তিমিরকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়, তখন রীতিমত চটে গিয়েছিল সে।

বলেছিল, বড় হলেই বুঝি ভাল হয়। তা হলে তো আমাদের বাসগুলোই ভাল, কলকাতায় যে ছোট ছোট মটর চলে সেগুলো...

মালা ততক্ষণে হেসে হাততালি দিয়ে উঠেছে। মটর কী ছোটদা, তুমি একেবারে গেঁয়ো হয়ে গেছ। মটর কী, গাড়ি বল, মটর তো মটর ডালকে বলে।

তা শুনে আরও চটে গিয়েছিল তিমির। সেদিন এই সরু সরু এক জোড়া লাইনকে কত আপনার মনে হত, এই ক্ষুদে ইঞ্জিন

আর ক্ষুদে ক্ষুদে কামরাগুলোর সঙ্গে ছিল প্রীতির সম্পর্ক, নিবিড় প্রেম। কেউ ঠাট্টা করলে মনে হত যেন তিমিরকেই সে ঠাট্টা করছে।

অথচ আজ সুলতা-বউদিদির কথাটা তার বুকে বিঁধল না। বরং মনে হল, এ-কথাটা সে নিজেই যেন বলতে পারত। এমনি উপহাসের চোখেই যেন ট্রেনটাকে দেখতে শিখেছে সে।

ধিকিধিকি করে এগিয়ে এসে ট্রেনটা তখন ছোট্ট একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। আর স্টেশনের নাম দেখে সুলতা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে শুরু করেছে, রত্না আর রত্নার মার সঙ্গে চোখো-চোখি করে।

সত্যি, কী বিদঘুটে নাম সব এদিকের স্টেশনগুলোর, তিমিরের মনে হল। আর কী কুৎসিত অর্থ সে নামের! উচ্চারণ করতেও লজ্জা হয়। কিন্তু এতদিন তো তা মনে হয় নি।

ছোট স্টেশন, একজনই স্টেশন-মাস্টার, তিনিই কালো কোট পরে টিকিট বিক্রি করছেন, ট্রেন থেকে দেখা যায়। ট্রেনের কামরা থেকেই দেখা গেল, তিনিই এগিয়ে গিয়ে ঘণ্টা বাজালেন।

একরাশ গেঁয়ো লোকের ভিড় প্ল্যাটফর্মের বাইরে। একটা বাস—ঝুড়ি বাক্স থলে আর মানুষে ঠাসাঠাসি। তার পাশে গোটা কয়েক গরুর গাড়ি। গরুগুলো বসে বসে ধুঁকছে। ওদিকে খানকয়েক চালাঘর, মিষ্টির দোকান একটা, মনিহারী আর গোল-দারি দোকান পাশাপাশি। তারও ওপারে একটা ধান-কল। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, সামনে বিস্তৃত উঠোনে ধান ছড়ানো আছে—রোদে শুকোতে দিয়েছে হয়তো। সাঁওতাল মেয়েগুলো দু দিক থেকে দুটো দড়িতে বাঁধা একটা কাঠের পাটা টেনে টেনে ধানগুলো জড়ো করছে এক জায়গায়।

সুলতা-আর রত্নার হাসিও পায়, মজাও লাগে। নতুন একটা পৃথিবী দেখছে যেন, নতুন মানুষ।

দেখতে দেখতে পরের স্টেশনে এসে পৌঁছে গেল ট্রেন।

তিমির বললে, এবার নামতে হবে আমাদের।

আরও ছোট স্টেশন। তবু ভাগ্য ভাল তিমিরের, জনকয়েক চেনা মুনিষ পেয়ে গেল। আর দুখানা গরুর গাড়ি।

তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র নামিয়ে নিল তারা। আর ট্রেনের গার্ড নিজেই এসে টিকিট কখানা নিয়ে ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে উঠে পড়ল গাড়িতে।

ট্রেন চলে গেল ধিকিধিকি করে। শুধু ধোঁয়াটুকুই দেখা গেল দূর থেকে।

নির্জন নিঃশব্দ প্রান্তর। দোকানপাট নেই তেমন এদিকে। লোকজনও তাই কম।

গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র এবং রত্নাদের তুলে দিয়ে আলপথে বাড়ির দিকে পা বাড়াল তিমির।

এতক্ষণ তবু বেশ নির্ভয়ে কেটেছে তার! কিন্তু এখন একটা আতঙ্ক চেপে বসেছে তার বুকে।

বাবা-মা কী ভাববেন, ছোট বোনগুলো কী ভাববে, পাড়া-পড়শী কী ভাববে! তাছাড়া এখানে থাকার কী ব্যবস্থাই বা হবে রত্নাদের?

তাই আলপথ ধরে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল তিমির, গরুর গাড়িটা ঘুরপথে এসে পৌঁছনোর আগেই যাতে পৌঁছতে পারে।

গরুর গাড়িটা ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক ধরে বাঁক নিতেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিমির রাস্তাটা পার হয়ে পুকুরধারের ছোট্ট সাঁওতাল-পল্লীর

টিউবওয়েলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তারপর এঁকেবেঁকে, অশথ-গাছটার পাশ দিয়ে কাঁদর পার হয়ে যখন কচুরিপানায় ঢাকা গড়ের পাড়ে এসে দাঁড়াল, বিস্মিত হল সে দূর থেকে মালাকে দেখতে পেয়ে।

সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছ-ধরা দেখছে মালা।

ছুটে এল তিমির, মালাও এগিয়ে এল।

—মালা, তুই? কবে এলি? এত বড় হয়ে গেছিস?

মালা হাসল।—পরশুদিন এসেছি, মাও এসেছে। তুমি বুঝি বোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছ?

কিন্তু এ-সব প্রশ্নোত্তরের সময় নয় এখন। ধীরেসুস্থে জিগ্যেস করলেই হবে, কানপুর থেকে হঠাৎ তারা চলে এসেছে কেন, বোমার ভয়ে, না টমি সৈন্যের ভয়ে?

তিমির বললে, মালা, একটা মুশকিল হয়ে গেছে।

—কী মুশকিল?

—রত্নারা আসছে, কোথাও যাবার জায়গা ছিল না ওদের, রত্নার বাবা বললেন, তাই···

মালা ফূর্তিতে হাততালি দিয়ে উঠল।—তাই নাকি, বেশ মজা হবে, বেশ মজা! কবে আসবে?

তিমির ভুরুভুরু বুকে বললে, কবে নয়, আসছে, কাঁদর পার হয়ে অবিনাশকাকাদের গরুর গাড়িতে। তুই গিয়ে বাবাকে বল্, হয়তো রেগে যাবে বাবা।

—দুর্। বলে একটা অদ্ভুত শব্দ করে ছুটে গেল মালা বাড়ির দিকে।

পিছনে পিছনে তিমিরও এসে ঢুকল।

সব শুনে তিমিরের বাবা এক মুহূর্ত একটু বিব্রত বোধ করলেন। তারপরে বললেন, তা বেশ তো, বাইরের বাংলো-

বাড়িটা খালিই পড়ে থাকে, ওঁরা না হয় থাকবেন দিনকয়েক। কই, ওঁরা কোন্ দিক দিয়ে আসছেন?

বলে নিজেই এগিয়ে গেলেন তিনি অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে।

তিমিরের মা ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এলেন।

—বেশ করেছিস, মানুষের বিপদে আপদে দুদিন এসে থাকবে, ভালোই করেছিস। হ্যাঁ রে, বোমা পড়ে কলকাতার আর কিছু থাকবে না? সত্যি?

উত্তর দিতে পারলে না তিমির। মাকে প্রণাম করতে গিয়ে দু চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল তার।

বাবা আর মার ওপর নতুন করে শ্রদ্ধায় ভালবাসায় তার বুক ভরে গেল। আনন্দের অশ্রু বইল দু চোখে। মা আর বাবা এত বড়, এত মহৎ! আর তাঁরা কী ভাববেন এই ভয়েই না সারাটা পথ তার অস্বস্তিতে কেটেছে! আতঙ্কে চুপ করে থেকেছে!

আশ্চর্য, কলকাতায় গিয়ে মা-বাবার রূপটাও কী সে ভুলে গিয়েছিল? নিজে ছোট হয়ে গেছে বলে কি তাঁদেরও ছোট ভাবতে শিখেছিল?

শুধু ছোট নয়, বকুলডাঙা যেন আর-পাঁচটা গ্রাম থেকে বিশ পঁচিশ বছর পিছিয়ে আছে। আর নামেই বকুলডাঙা, বকুলগাছ বোধ হয় একটাও নেই। মাত্র পাঁচ-সাত ঘর স্বচ্ছল পরিবার, বাকী পনের-বিশ ঘর যা বাগদী-কোটালের বাস, তাদেব সকলেরই অবস্থা খারাপ। তবু ধানের দর উঠেছে বলে খেয়ে-পরে বেঁচে আছে পাঁচ-সাতটা বামুন কায়েত পরিবাব। সবাই চাষী, চাষেব ধানেই বছর কাটে।

গাঁয়ে পাঁচ-ছটা মাঝারি মাপের পুকুর, কিন্তু তার বারো আনাই কচুরিপানায় ঢাকা। যে-টুকুব বা জল দেখা যায় তারও বেশীর ভাগ পাড়েব বাঁশ-ঝাড়ের পাতায় অপরিষ্কার হয়ে আছে। ইটের দালান শুধু একটাই—বেনেবাবুদের। এতকাল খালি পড়ে ছিল, বোমার ভয়ে তারাও ফিরে এসেছে।

প্রকাশবাবু সপরিবারে এসেছেন শুনেই বেনেবাড়িব বড়বাবু ছুটে এলেন।

ফরসা টকটকে রঙ বড়বাবুর, চেহারাটাও লম্বা-চওড়া। কিন্তু বড় অমায়িক ব্যবহাব, কথায় বার্তায় বিনয় ঝরে পড়ে।

এসে মাথা নুইয়ে জোড় হাত করে নমস্কাব করলেন তিনি প্রকাশবাবুকে।

তারপর বললেন, আমাদের ভাগ্য আপনার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পদার্পণ ঘটল এ গ্রামে। গ্রামের ভাগ্য।

প্রকাশবাবু অস্বস্তি বোধ করলেন। অতিবিনয়ের ভঙ্গিটুকু ঠাট্টার মত শোনাল তাঁর কানে।

কিন্তু পরক্ষণেই বড়বাবু এমনভাবে আসর জমিয়ে বসলেন,

অন্তরঙ্গ হয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন যে, নিজের ভুল বুঝতে পারলেন প্রকাশবাবু।

তিমিরের বাবাও এসে যোগ দিলেন। পরিচয় দিলেন বড়বাবুর।

তা শুনে প্রকাশবাবু হাসলেন।—আপনার পদার্পণ ঘটেছে দেশের মাটিতে সেটাই তো ভাগ্য এ গ্রামের।

জিভ কেটে মাথা নাড়লেন বড়বাবু। মাদুরের ওপর হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকালেন। বললেন, গাঁয়ের মাটি—যেখানেই থাকি আমাদের মাথায় থাকে, এ মাটিতে কি পদার্পণ করা যায়! বোমার ভয়ে যখন দিক্‌বিদিকে ছুটছে কলকাতার লোক, তখন দেখুন এই মা-টিই তো কোল দিল!

পরক্ষণেই থেমে জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা, হাওড়ার পুল কি খুলে দিয়েছে?

না, খুলে দেয় নি। কিন্তু এমন একটা গুজব প্রকাশবাবুও শুনেছেন, শুনেছিলেন বলেই তাঁর পরিবারের লোক কটিকে নিরাপদে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন।

পাড়ার সব লোক পালিয়েছে, মিলিটারির হাঁকডাক বাড়ছে, জিনিসপত্তর পাওয়া যায় না, তার ওপর বোমার ভয়—এসবের জন্যেই মেয়েদের এ গাঁয়ে নিয়ে এসেছেন, জানালেন প্রকাশবাবু।

বললেন, তিমিরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হলে যে কী করতাম!

সত্যিই তো, কী করতেন তিনি, এমন একটা নিরাপদ আশ্রয় না পেলে! তার জন্যে তাঁর সঙ্কোচও কম নয়।

তিমিরের বাবা বাধা দিলেন।—এ সব কী বলছেন আপনি! মানুষের বিপদে আপদে এ আশ্রয় তো আপনিও দিয়েছেন। সকলেই দেয়।

দেয় কি? কথাটা বিদ্রূপের মত মনে হল প্রকাশবাবুর।

শহুরে মানুষ তিনি, পাড়াপড়শীর সঙ্গেও দূরত্ব রেখে চলেন। কই, কোনদিন তো কাউকে আশ্রয় দেন নি, বিশ্বাস করেন নি।

তবু তিমিরের বাবার কথায় যেন মানুষের ওপর আস্থা ফিরে পেলেন। আর তাঁর ভরসাতেই সকলকে রেখে দিনকয়েক পরেই ফিরে গেলেন প্রকাশবাবু। চাকরি বজায় রাখতে।

রত্নার প্রথম প্রথম ভালই লেগেছিল গ্রামটা। সেই একবার মামার বাড়ি গিয়েছিল সে বীরভূমে। তারপর মামাও মারা গেছেন, আর কখনও কোন গ্রামে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি তার। তাছাড়া সে তো অনেক কম বয়সে।

রত্না অবশ্য প্রথমটা বুঝতে পারে নি, বকুলডাঙাকেই তার ভাল লেগেছে, না কি তিমিরের গ্রামকে? তিমির না থাকলে কি এত ভাল লাগত তার?

কিন্তু কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হওয়ার ঘোর কেটে গেল দুটো দিন পার হতেই। আর সঙ্গে সঙ্গে খুঁতখুঁতুনি শুরু হল সকলের।

তাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল তিমিরদের বাংলোবাড়িতে।

খড়ের চালা, মাটির দেওয়াল, নীচেটাও সিমেন্ট করা নয়। সব সময়েই স্যাঁতসেঁতে। বিশেষ করে সকালে যখন পাটকরুনী ঝি ঘরদোর নিকিয়ে দিয়ে যায়, সারা ঘর আর উঠোন পিছল হয়ে থাকে। তখন রীতিমত গা ঘিনঘিন করে রত্নার। মনে হয় হাঁটতে গেলেই বুঝি পিছলে পড়বে। আর সন্ধ্যে হলেই সাপের ভয়ে এক পা বাইরে যেতে সাহস হয় না।

রত্নার দুশ্চিন্তা এইটুকুই। কিন্তু তার মা দিনরাত ভাবেন স্বামীর কথা। মানুষটা তাদের নিরাপদে রেখে কলকাতায় ফিরে গেছে চাকরি বজায় রাখতে। চিঠিপত্র আসতে দেরি হয়। অথচ একটার

পর একটা গুজব আসে দ্রুতপায়ে। কখনও শোনেন হাওড়ার পুলে বোমা পড়েছে, কখনও শোনেন ট্রেন-লাইন তুলে ফেলেছে ইংরেজ সৈন্যেরা।

সুলতারও ওই এক দুশ্চিন্তা। স্বামী নাকি উপরি টাকার লোভে কী সব বন্‌ড্‌ সই করেছে, বোমা পড়লে বা জাপানী সৈন্য এসে পড়লেও পালাবে না বলে। এক ভরসা—সে কলকাতায় থাকে না, থাকে অনেক দূরে। বোমার ভয় বা জাপানী সৈন্যের ভয় সেখানে অতটা নেই।

এরই মধ্যে মালা আর মালার মা অর্থাৎ তিমিরের ছোট-মামীমা এসে দশটা দিন ছিল, তাই রত্নাদের অতটা অসহ্য লাগে নি। কিন্তু তারা তো থাকবার জন্যে আসে নি। বকুলডাঙা থেকে গরুর গাড়িতে পাঁচ-ছটি গাঁ পার হয়ে তিমিরের মামার বাড়ি। সেখানেই মালাদের রেখে গিয়েছিলেন ছোটমামা। রেখে ফিরে গেছেন সেই কর্মস্থল কানপুরে। তা না করেই বা কী করবেন! কলকাতায় যেমন বোমার ভয়, তেমনি অন্য সব শহরেই ব্রিটিশ আর মার্কিন সৈন্যের ভয়। বিশেষ করে নিগ্রো সৈন্যগুলো যখন রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ায়, বাঙালীদের ভীরু মনে সাহস জোটে না। মাঝে মাঝে দু-একটা আতঙ্কের খবরও শোনা যায়, আলোড়ন হয়—কোথায় কোন্ সৈন্যদল কোন্ গৃহস্থ ঘরে চড়াও হয়েছে। মৃত্যুর দিকে যে-কোন মুহূর্তে এগিয়ে যেতে হবে জানে বলেই লাজলজ্জা ভদ্রতাজ্ঞান পাপপুণ্য ইত্যাদির তোয়াক্কা করে না তারা। তা ছাড়া পথে ঘাটে যে-ভাবে বেলেল্লাপনা করে বেড়ায়, পরিবারের মেয়েদের জন্য বিব্রত বোধ করে সকলেই। তাই নিশ্চিন্ত হবার জন্যে অন্য অনেকের মতই মালারাও নিজেদের গাঁয়ে ফিরে এসেছিল। আর তারই ফাঁকে দু-দশ দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিল বকুলডাঙায় তিমিরদের বাড়িতে। কিন্তু বেশীদিন থাকলে

তো চলবে না। ঘরদোর সাফ করে ভালমত একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। কে জানে কতদিন এখন পড়ে থাকতে হবে! গ্রামের বাড়িতে তাই মালারা চলে গেল।

আর মালারা চলে যেতেই বড় অস্বস্তি বোধ করল রত্না। রত্নার মা আর সুলতা-বউদিও। মালারা থাকতে যতখানি ঘরোয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আর রইল না।

এদিকে ইস্কুল-কলেজ নেই। খবরের কাগজ আসে হপ্তায় একদিন, সিনেমা-থিয়েটার নেই। কী নিয়ে থাকবে রত্নারা? সারাটা দিন যেন কাটতে চায় না। দুপুরটা যদিবা মাদুর বিছিয়ে গড়িয়ে নেওয়া যায় একবারটি, সন্ধ্যে হলেই কিন্তু নিঝুম সব। সারা গাঁ সন্ধ্যে থেকেই অন্ধকারে ডুবে যায়, দু-চারটে হারিকেন লণ্ঠন যদি-বা দূর থেকে দেখা যায় এ-বাড়ি সে-বাড়ি, রাত একটু বাড়তে-না-বাড়তে সেগুলোও নিবে যায়। এমনিতেই বেশী রাত অবধি আলো জ্বালবার মত পয়সা নেই বাসিন্দেদের, যা-ও বা আছে, কেরোসিন পাওয়া যায় না। তিন মাইল দূরের স্টেশনের দোকানে সাত দিন হত্যে দিয়ে তবে এক বোতল কেরোসিন পাওয়া যায়।

রত্নারাও তাই সন্ধ্যের সময়ে বৈঠকখানার বারান্দায় অন্ধকারে বসে জোনাকি দেখে আর গল্পগুজব করে। কোন-কোনদিন তিমির এসে বসে, কোনদিন বা তিমিরের মা।

প্রথম প্রথম প্রতি সপ্তাহে প্রকাশবাবু আসতেন। দেখাশোনা করে যেতেন। টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন কলকাতা থেকে। তার সঙ্গে নানান গুজব।

কিন্তু তাঁরই বা এত ধকল সইবে কেন! বুড়ো হয়েছেন, নিত্যদিন ট্রেন-জার্নি পোষায় না। এদিকে বোমাপড়ার কোন আশঙ্কাও আর নেই যেন। কিছু কিছু লোক আবার ফিরে আসছে কলকাতায়।

প্রকাশবাবু তাই একদিন বলেই বসলেন, এবার এদের সব নিয়ে যাব ভাবছি। বোমাটোমার ভয় আর নেই মনে হচ্ছে, লোকও অনেক ফিরে আসছে।

রত্না শুনল, তিমির শুনল।

আশ্চর্য! একদিন, এই কয়েকটা বছর আগে যেদিন পরস্পর পরস্পরের কাছে এসেছিল, ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, সেদিন কত না নিদ্রাহীন রাত আর নির্জন তুপুর কেটেছে মনের কোণে স্বপ্ন বুনে! তুজনই তুজনকে কাছে পেতে চেয়েছে।

তারপর এতটুকু একটা ভুল-বোঝাবুঝির জন্যে, নাকি সেই বিবাহদিনের আকস্মিক মুহূর্তে তিমির ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল বলেই সে-প্রেম এমন ভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

তুজনই তারপর থেকে সযত্নে সেই নরম স্মৃতিটুকুকে ডানাভাঙা একটা ভয়ার্ত বুলবুলের মত বুকের উষ্ণতায় লালন করেছে। তার মধ্যেই যেন কত শান্তি, কত আশ্বাস!

কিন্তু আবার যেদিন আকস্মিকভাবেই পরস্পর আবার পরস্পরের কাছে এসে পৌঁছল তখন তুজনই যেন উচ্ছল স্রোত হারিয়ে ফেলেছে।

এ এক বিচিত্র অনুভূতি! তুটি প্লাবনের নদী একবার পরস্পরকে আলিঙ্গন করে যখন দূরে সরে যায়, বহুদূরে গিয়ে আবার মিলিত হতে চায় অতীতের স্মৃতির টানে, তখন সে মিলনের মধ্যে বুঝি উদ্দামতা থাকে না, আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

তাই প্রথমটা কোন উৎসাহ বোধ করে নি রত্না। তবু ভেবেছিল এই বকুলডাঙার সঙ্কীর্ণ পৃথিবীতে এসে হয়তো তার হারিয়ে-যাওয়া জীবনটাকে আবার খুঁজে পাবে।

পায় নি। এত কাছে এসেও বড় দূরে রয়ে গেছে। শুধু অস্বস্তি নয়, রত্না যেন কোন আগ্রহ ফিরে পায় নি।

নানা অছিলায় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তিমির, হাসতে চেয়েছে, হাসাতে চেয়েছে, কথা বলতে, বলাতে। কিন্তু সে-সবের পিঠে রত্না সাড়া দিয়েছে একটা রুগ্ন মানুষের নির্জীব গলায়।

এর চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পায় ও শান্তনুর সান্নিধ্যে। ছোট বোন রানীর স্বামী শান্তনু। রানীর? কী আশ্চর্য, ছোট্ট এই ভুলটুকু না করলে শান্তনুর সঙ্গেই জড়িয়ে যেত রত্নার জীবন।

সেই রাতটার কথা মনে পড়লে আজও শিউরে ওঠে রত্না। সেই যেদিন খিড়কির দরজায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফেরার পরেও যেদিন ক্লান্তিতে, অবসন্নতায় উঠে দাঁড়াবার শক্তি পায় নি, শ্রান্ত বেদনায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

যখন জ্ঞান ফিরেছিল তার—নাকি লজ্জায় আর ক্লান্তিতে যে বিষণ্ণ ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল তা থেকে জেগে উঠেছিল—তখন শান্ত নিঝুম হয়ে গেছে কাশী বোস লেনের বাড়িটা। রোশনচৌকি থেমে গেছে তখন, ত্রিপল খুলে নিয়ে গেছে। গ্রাম্যমেলার মত হঠাৎ-আলোর আনন্দে একটা রবরবা জেগে উঠেছিল। তারপর মেলার শেষে যেমন গ্রামের প্রাণ মিইয়ে যায়, ভাঙা হাঁড়ি-কলসী, অকেজো বাঁশ আর দড়ির টুকরোর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে তেমনি একটা বিষণ্ণতা, তেমনি এক অসহ্য নীরবতা বাড়ির সিঁড়িতে, দেয়ালে, ছাদে, বারান্দায়—হলুদ আলতা সিঁদুরের ছোপেছাপে।

কী অসহ্য যে লাগছিল রত্নার! চুপচাপ শুয়ে ছিল সে এক পাশের ঘরে। একবার বড়-বউদি, একবার সুলতা, কখনও এক ফাঁকে মা এসে দেখে যাচ্ছিল, হাত বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল কপালে।

একবার শাঁখের শব্দ শুনেছিল। কিন্তু তখনও স্পষ্ট বুঝতে পারে নি, কী হল, কী হয়ে গেছে!

একটু একটু করে লজ্জা ভেঙেছিল, একটু একটু করে কানে

এসেছিল, তাকে খুঁজে না পেয়ে ছোট বোন রানীর সঙ্গেই বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে বরের।

হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে। তার জন্যে কোন দুঃখ নেই রত্নার। কিন্তু বর—তার না, রানীর বর—কেমন দেখতে, কেমন মানুষটা জানতে ইচ্ছে হয়।

যেমনই হোক, রানী যেন সুখী হয়। তার জীবন ব্যর্থ হয়েছে ভুল পথে পা বাড়িয়েছিল বলে। রানীর জীবন যেন ভেঙে না যায়।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কেউ তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করছে না কেন? এসে গল্প করছে না কেন ছোট-বউদি!

না, কারও কোন আগ্রহ দেখতে পায় নি রত্না, কেউ কিছু জিগ্যেস করে নি।

সকলেই হয়তো ধরে নিয়েছিল এ বিয়েতে মত ছিল না রত্নার, বর পছন্দ হয় নি। কিন্তু পছন্দ না হবার কী ছিল, তা কেউ ভেবে দেখে নি।

রত্না ভেবেছিল, ছোট-বউদি অন্তত একসময়-না-একসময় জিগ্যেস করবে। কিন্তু না, কোনদিনই জিগ্যেস করে নি। কেউ না। মা, বাবা, দাদা, বউদিরা—কেউ না।

আসলে তার কথা কেউ তখন ভাবেও নি। যত গল্প আলাপ আলোচনা তখন রানী আর নতুন জামাইকে ঘিরে।

সুলতা এসে হয়তো কখনও বলেছে শুধু, চান করে নাও ঠাকুজ্জি, বেলা হয়েছে।

মা বলেছে, খেয়ে নিবি যা রত্না।

বাড়ির বেড়ালটার সঙ্গেও লোকে এর চেয়ে বেশী কথা বলে। অথচ রত্না যেন কেউ নয়। ভালবাসার বেড়ালটার সামনে মানুষ মাছের কাঁটা ফেলে দিয়ে যেমন আদর করে ডাকে, তেমনি আবার দুধের কড়াইয়ের দিকে এগিয়ে গেলে ধমকও দেয়।

অথচ রত্না যে এতবড় একটা অন্যায় করল, তবু কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বাবা যদি বকুনি দিত তা হলেও শাস্তি পেত সে।

সে রাত্রির কথা ভাবতে গেলেই সারা শরীর জ্বলে উঠত তার রাগে অভিমানে। হ্যাঁ, তিমিরের বিরুদ্ধে।

কিন্তু তিমিরের সঙ্গে যখন আবার দেখা হল, ঘটনাচক্রে যখন তিমিরদের গ্রামে, তিমিরদেরই বাংলোবাড়িতে এসে আশ্রয় নিল রত্না, তখন সব অভিমান, সব ক্রোধ ধুয়ে মুছে গেছে তার মন থেকে।

তবে কি সে-প্রেম মরে গেছে তার মনের গোপনে? হয়তো তাই। তা না হলে তিমিরের সঙ্গে দুটো কথা বলার, একটু কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হয় না কেন?

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসা-যাওয়া করছিলেন প্রকাশবাবু, বেশ কয়েকটা মাস এমনিভাবেই কেটে গেল। কলকাতায় একা থাকেন, মেসে হোটেলে খান, আপিস করেন।

আর এরই ফাঁকে তিমিরের কাছ থেকে ক্রমশ কী করে যেন দূরে সরে গেছে রত্না।

তাই প্রকাশবাবু হঠাৎ এক সপ্তাহে এসে যখন বললেন, আর কোন গোলমালের ভয় নেই, বোমা পড়বে না কলকাতায়, তাই সকলকে নিয়ে যাব ভাবছি এ সপ্তাহেই, তখনও রত্নার মনে কোন ঢেউ উঠল না।

কিন্তু তিমিরের মনে যে এ-খবরটুকু হঠাৎ একটা নাড়া দিয়েছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না রত্নার। রত্না বেশ বুঝতে পারল, তিমির এত দূরে দূরে থাকছিল বটে, একটু বা অপরাধীর মত, তবু এ-খবরটা শোনার পর থেকে সে যেন কেবলই সুযোগ খুঁজছে রত্নার সঙ্গে একটু নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলবার

জন্যে। কয়েকটা প্রচ্ছন্ন ইশারা-ইঙ্গিতও বুঝেছে, তবু সাড়া দেয় নি রত্না। উপেক্ষা করেছে, নিজের মনেই হেসেছে। যে মন মরে গেছে, তার তলায় জল ঢেলে কী হবে ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারল না রত্না।

খড়ে-ছাওয়া বাংলোবাড়িটা উঠোন থেকে অনেকখানি উঁচুতে। তাই সেখান থেকেই রত্না দেখতে পেল, খড়ের পালুই পার হয়ে নোংরা ডোবার ওপারে, গোয়ালের ওপারে ছোট্ট পুকুরটা থেকে কচুরিপানা তুলছে জনকয়েক লোক।

কচুরিপানার ফুল যে এত সুন্দর হয়, এমন সুন্দর বেগুনী রঙ আর বর্মী মেয়েদের খোঁপার মত দেখতে, তা জানত না রত্না। কিংবা দেখেও দেখে নি সে এতদিন।

দূর থেকে ফুলগুলো দেখতে পেয়েই ছুটে বেরিয়ে এল রত্না।

পাড়ে পানাগুলো তুলে ফেলছিল, তা থেকে কাদা বাঁচিয়ে গোটা কয়েক ফুল ভেঙে নিল রত্না। ফিরে আসছিল সে ফুল-গুলো নিয়ে, সুলতার—ছোট-বউদির খোঁপায় পরিয়ে দেবে বলে।

মাঝপথে আটকা পড়ল। খড়ের পালুইয়ের বাঁকেই মুখো-মুখি পড়ে গেল তিমিরের সঙ্গে।

তিমির থমকে দাঁড়াল। কী যেন বললে, বলে গেল অনর্গল। কিন্তু যা বলল সে, তার একবর্ণও রত্নার কানে গেল না। কিছুই যেন বুঝতে পারল না।

বিস্ময়ে শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল রত্না। আর পর-ক্ষণেই ভয় পেয়ে গেল সে। এ কী উন্মাদের দৃষ্টি তিমিরের চোখে! এ যেন অপরিচিত কেউ, তার সেই অনেক চেনা মানুষটার মধ্যে হঠাৎ একটা ক্ষুধার্ত বাঘের কপিশ চোখ তীব্র হিংসায় জ্বলে উঠেছে।

এদিক ওদিক তাকাল রত্না, ছুটে পালাবে কিনা ভাবল।

কিন্তু ততক্ষণে সন্ধিলগ্নের শেষ সূর্য টুপ করে ডুবে গেছে— কেমন একটা আবছা অন্ধকার। এদিকে জায়গাটাও নির্জন। ঘরের পাঁচিল আর খড়ের পালুইয়ে ঢাকা জায়গাটা হঠাৎ যেন বীভৎস হাসি হাসল। রত্না ছুটে পালাবার আগেই তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছে তিমির।

একটা উন্মত্ত কামনার স্ফুলিঙ্গ যেন।

ছাড়া পাবার চেষ্টায় ছটফট করল রত্না। কিন্তু দুটি সবল প্রমত্ত হাতের কাছে, একটি ভয়ানক আর কঠিন শরীরের কাছে তার নরম ভয়ার্ত শরীর অবশ হয়ে গেল।

রত্না শুধু অনুভব করল উষ্ণ আর দ্রুত এক নিশ্বাস যেন তার মুখে চোখে চুলে কপালে বার বার কামনার স্পর্শ দিয়ে গেল।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আর বিপর্যস্ত মনে যখন ছুটে পালিয়ে এল রত্না, তখন তার দু-চোখে জল—শুধু জল। আর গালে, কপালে, সারা দেহে শুধু জ্বালা আর জ্বালা।

একটা গোপন ভয় আর আশঙ্কা বুকে চেপে কলকাতায় ফিরে এল রত্না। আর রত্না চলে আসার দিন কয়েক পরেই তিমিরও চলে এল।

বোমার ভয় নেই যখন, সব গোলমাল যখন মিটে গেছে, তখন কলেজ কামাই করে কী লাভ হবে।

যেন এক নতুন রত্নাকে আবিষ্কার করেছে সে। সেই প্রেম আর স্বপ্ন দিয়ে গড়া গোপন মনে লালন করবার মত একটি মধুর স্নিগ্ধতা নয়, আগুনের মত তপ্ত আর উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট এক তীব্রতা।

না, এ-রত্নাকে হারাতে পারবে না সে। এ-রত্না তার জীবনকে, যৌবনকে আলোকিত করেছে। এ-রত্না সেই চায়ের দোকানে মুখোমুখি বসবার, গলিপথে হাতে-হাত ধরে ঘুরে বেড়াবার মত ভোরের আলো নয়, সন্ধ্যার জ্যোৎস্না নয়। এ-রত্না মধ্যদিনের সূর্যকরোজ্জ্বল তপ্ত আবেগে পরিপূর্ণ।

এ বড় বিচিত্র নেশা, দুর্বোধ্য উন্মাদনা!

আর জীবনের এই জীবন্ত অভিজ্ঞতাকে, এই ঐশ্বর্যকে কারও কাছে প্রকাশ করে না বলে যেন শান্তি নেই। তৃপ্তি নেই।

মেসের ঘরে জিনিসপত্তর তুলে দিয়েই তাই অরুণাভর খোঁজে ছুটল সে।

অরুণাভ। যার কাছে সব কিছু খুলে বলা যায়। যাকে সব কিছু না বলে যেন আনন্দ নেই। না, কোন অন্যায়, কোন পাপবোধ স্পর্শও করে নি তাকে। এই বুঝি যৌবনের ধর্ম।

পথে বেরিয়েই তিমির বুঝল, শহরটা আবার স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে। আর সেই ভয় নেই লোকের মুখেচোখে। একটা আত্মতৃপ্তির ভাব যেন সকলের মনে। তেমনি পুরনো দিনেব মত ভিড় পথে পথে, তেমনি অলস আলাপ।

অরুণাভর বাড়ির দরজায় এসে কিন্তু চমকে দাঁড়াল তিমির। কেমন একটা থমথমে ভাব। অসংখ্য লোকজন জমা হয়েছে বাড়ির সামনে। আর সামনের উঠোনে খাট-আলমারি আসবাবপত্র স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

বিস্মিত হয়ে ভিড়ের মধ্যে থেকেই একজনকে বেছে নিয়ে তিমির ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ব্যাপার কী জানবার জন্যে।

কিন্তু প্রশ্ন করবার আগেই চমকে উঠল। কে যেন একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে তার পিঠে।

চমকে ফিরে তাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে একমুখ কৌতুকের হাসি হেসে অনাথ বললে, আরে চলে আয়, চলে আয়। যত সব বড়লোকী কেচ্ছা।

একরকম টানতে টানতেই তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল অনাথ।

নিয়ে গিয়ে বসল পাড়ার একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে। দুটো ডবল-হাফ চায়ের অর্ডার দিয়ে অনাথ বললে, তোব খবর আগে শুনি।

তিমির বললে, তোর খবর বল্। কলেজ খুলেছে ?

হাসল অনাথ।—কে আর ও-সবেব খবব রাখে ভাই! পড়াশুনোর আর কোন দাম নেই রে, দিনকাল পাল্টে গেছে।

—মানে ?

—তুই সেই গেঁয়োই রয়ে গেলি। এত সব ওলট-পালট হয়ে গেল, দেখতে পাস নি ? ডিগ্রির আর কোন দাম নেই, এখন দাম শুধু টাকার। ব্ল্যাক-মার্কেট করে কত গবেট লাখ লাখ টাকা

করে ফেলেছে, চাকরি করছে যারা তারা দেদার ঘুষ নিচ্ছে, দেখছিস না, এ যুদ্ধে ওসব পাপ-পুণ্যের দোহাই ধুয়ে মুছে গেছে।

—তা বলে পড়া ছেড়ে দিবি? বিস্মিত হল তিমির।

অনাথ হাসল, তেমনি ধূর্ত হাসি। বললে, যুদ্ধ থেমে গেলে আর চাকরি-টাকরি পাবি ভেবেছিস? তাই লেগে পড়লাম, একটা চাকরি পেয়ে গেছি আর্মিতে, চিঠি এসে গেছে। দুদিন পরে হয়তো চিনতেই পারবি না পোশাক দেখে, কাঁধে একটা ফুল, দুটো ফুল, তারপর তিনটে ফুল।

তিমির কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকাল।

অনাথ বললে, ফার্স্ট লেফটেনেণ্ট, সেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট, তারপর ক্যাপ্টেন। চাই কি মেজরও হয়ে যেতে পারি। আর ওই আর্মিতে চলে যাব বলেই তো দেখা করতে এসেছিলাম অরুণাভর সঙ্গে, এসে যা শুনলাম...

হো-হো করে হাসল অনাথ। যেন কত বড় একটা কৌতুকের কথা শুনে এসেছে সে।

তিমির জিগ্যেস করলে, কী ব্যাপার বল তো?

—ব্যাপার আর কী, অরুণাভর বাবা মারা গেছেন।

—মারা গেছেন? ধক করে লাগল যেন তার বুকে। যতই হোক, মানুষটা তাকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। বিপদে পড়লেই ছুটে আসতে বলেছিলেন। তিমিরের বাবা না থাক কলকাতায়, জ্যাঠামশাই আছেন—এ কথা বহুবার বলেছিলেন তিনি আদর করে। সার্টিফিকেট? প্রয়োজনে একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেন নি বলে কি সত্যিই লোকটা হিপোক্রিট ছিলেন? কখনও না।

তিমির বললে, ছি-ছি, অরুণাভর সঙ্গে দেখা করে এলেই হত এ সময়ে...

অনাথ বাধা দিল—আসল ট্র্যাজেডি তো শুনিস নি।

—কী আবার?

অনাথ হাসল।—অরুণাভর বাবা অরুণাভদের কিছু দিয়ে যান নি, সব দিয়ে গেছেন এক বিধবাকে।

কথাটা যেন চাবুকের মত পড়ল তিমিরের মুখের ওপর। কী কুৎসিত, কী জঘন্য এর কথাটা!

তিমির প্রতিবাদ করল, কী যা-তা বলছিস।

অনাথ হাসল আবার।—যা-তা নয় রে। তুইও দেখেছিস হয়তো, ওদের দোতলায় খুব সুন্দরী এক বিধবা ভদ্রমহিলা ছিলেন।

বোকার মত চেয়ে রইল তিমির। মনে পড়ল সেই সুন্দর মুখখানা। নিষ্পাপ সরল সুন্দর সেই মুখ—যে-মুখ বহুবার চকিতের জন্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে।

একে একে সব কথা শুনল তিমির।

আশ্রয়হীনা দূরসম্পর্কের সেই রূপসী আত্মীয়াকেই নাকি যথাসর্বস্ব দিয়ে গেছেন ব্রজবাবু, উইল করে দিয়ে গেছেন।

বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল অনাথ। অর্থটা স্পষ্ট বুঝতে পারল সেও।

কিন্তু কিছুতেই যেন এত নীচ, এত ক্ষুদ্র ভাবতে পারল না ব্রজবাবুকে। তবে কি তার মতই কোন মুহূর্তের পদস্খলন থেকেই এই কলঙ্কের শুরু?

চায়ের পেয়ালা শেষ হয়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়াল অনাথ। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বললে, চলি, আর আমাকে ওই ব্লাডি বন্দে মাতরমের দলে দেখবি না কোনদিন। আ'ল বি এ মেজর, তোরা স্বদেশী করে চিরকাল মাইনর থাক ভাই, কোন লোভ নেই আমার ওতে।

বলে প্রাগ করল অনাথ। তারপর চলন্ত ট্রামটায় লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে বাই বাই করল।

একা একা ফিরে এল তিমির, তার সেই নোংরা মেসে। অরুণাভর দুঃখে মন ভরে ছিল তার, দুঃখ হচ্ছিল তার দুর্দশায়। কিন্তু তারই ফাঁকে হঠাৎ একবার নিজের মনেই হেসে ফেলল তিমির। ভাবল, ভালই হয়েছে। বড় বেশী বড়লোকী চাল দেখাত অরুণাভ—ঠিকই হয়েছে তার। এই হওয়া উচিত ছিল।

পরক্ষণেই নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হল তার। ছি ছি, ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেখানে এত গভীর, সুখে দুঃখে যে বন্ধুটির কাছে বার বার ছুটে গিয়েছে সে, শ্রেণীগত বিবোধটাই আজ তাকে এত দূরে ঠেলে দিচ্ছে কেন?

তবে কি ধনী আর মধ্যবিত্তের, ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বটা গড়ে ওঠে তা শুধুই বাইরের পালিশ? শ্রেণীগত বিরোধ-আক্রোশ-ঈর্ষা সবই সুপ্ত থাকে ভিতরে ভিতরে?

কিন্তু এই হিংস্র আনন্দটুকু উবে গেল পরের দিনই, যখন অরুণাভ এসে হাজির হল তার মেসে। সারা মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, গায়ে কোরা ধুতি একখানা, খালি পা।

বাবার শ্রাদ্ধের নেমতন্ন জানাতে এসেছিল অরুণাভ। বাবার বিরুদ্ধে যেন কোন অভিযোগ নেই তার। বাবার বিরুদ্ধে তার যেটুকু অশ্রদ্ধা আগেও দেখেছে তিমির, সেটুকুও নেই যেন।

আশ্চর্য, সেই ছেলেটা—যার কথায়বার্তায় নিজের পরিবার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার অন্ত ছিল না, পিতাকে উপযুক্ত সম্মান দিতেও যে কার্পণ্য করত, রাতারাতি সেই মানুষটা কী করে বদলে গেল এত বড় একটা আঘাত পেয়েও, এত বড় একটা কলঙ্কের বোঝা তাদের ঘাড়ে দিয়ে গেছেন ব্রজবাবু, এ-কথা জেনেও?

অরুণাভ চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবল তিমির। হয়ত কিছুই না, কিংবা রত্নার কথা।

সেই অসংযত মুহূর্তটির কথা ভেবে অনুশোচনায় দগ্ধ হল তিমির। অদ্ভুত একটা অন্যায়বোধে সারা শরীর জ্বলে উঠল তার, বিরক্তিতে মন বিষিয়ে উঠল।

প্রকাশবাবু পরিবারের সকলকে নিয়ে যাসার সময়ে বলেছিলেন, মেসে কেন থাকবে তিমিব, আমাদের বাড়িতে থেকেই কলেজ করো।

বলেছিলেন বটে, কিন্তু সে-আমন্ত্রণে কোন সত্যিকার আন্তরিকতা খুঁজে পায় নি তিমির। তা ছাড়া, রত্নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও ভয় ছিল তার। কী এক অস্বস্তি, সর্বগ্রাসী এক লজ্জা!

- রত্নার সঙ্গে একবার দেখা করার, ক্ষমা চাওয়ার, অনুশোচনা প্রকাশ করার ইচ্ছায় পথে বেরিয়ে পড়ল তিমির। কিন্তু ঘুরে ঘুরে কাশী বোস লেনের কাছে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ফিরে এল। সপ্রতিভ হয়ে বাড়ির কড়া নাড়তে সাহস হল না।

বকুলডাঙা থেকে পালিয়ে এসে বেঁচেছিল রত্না। তা না হলে এত কাছে কাছে থেকেও কী করেই বা তিমিরকে এড়িয়ে যেত সে। যে-কটা দিন ছিল মুখ তুলে তাকাতে পারে নি সে তিমিরের মতই। রত্না বেশ বুঝতে পেরেছিল, লজ্জা-অস্বস্তি শুধু তার একার নয়।

কলকাতায় ফিরে এসে নিশ্বাস ফেলে বাঁচল রত্না। কিন্তু তার মনের কাছে তিমির যেন কত ছোট হয়ে গেল। ছি ছি। সেদিনের কথা মনে পড়লেই সারা শরীর রি-রি করে ওঠে, কখনও বা বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদে আর কাঁদে। ভুল বোঝাবুঝির ঘাত-প্রতিঘাতে, কিংবা দীর্ঘদিনের দূরত্বের জন্যেই হয়তো সেই প্রেমের আকর্ষণ, সেই মনের আবেগ মরে গিয়েছিল। কিন্তু, স্মৃতির পট থেকে তো মুছে যায় নি কিছুই। কত দিন, কত নিঃসঙ্গ দুপুর কত অঘুমন্ত রাত্রিতে মনে মনে রোমন্থন করেছে সে মধুর অতীতকে, নাড়াচাড়া করেছে একটি নাম।

কিন্তু এই একটা ঘটনাতেই যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মনের তারে তারে যে সুরের যোগ ছিল, অকস্মাৎ তা ছিঁড়ে গেল।

না, এই নতুন পরিচয়ের মধ্যেও একটা অজানা অনাস্বাদিত আবেগ আছে, আকর্ষণ আছে। যৌবনের হাতছানি আছে। কিন্তু সেই মনের সম্পর্কটা যেন অনেক সুন্দর আর নরম আর মধুর ছিল। সেই সম্পর্কটা হঠাৎ যেন যৌবনের জোয়ারে ধুয়ে মুছে গেল।

রত্নার মনে হল, যা পেল সে, তার চেয়ে যা হারাল তা যেন অনেক বড় ছিল, অনেক গর্বের, আনন্দের, বেদনার—তাই অনেক আন্তরিক।

তার বদলে রত্না পেল শুধু লজ্জা আর লজ্জা।

তাই মনে মনে রত্না চেয়েছিল, তিমির যেন আর না আসে। এলে সে যে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না আর, কথা বলতে পারবে না।

তা ছাড়া এই নতুন তিমিরকে সে যে সত্যিই আর কাছে পেতে চায় না।

খুব স্পষ্টভাবে না হলেও, মনের অবচেতনে কোথায় যেন শান্তনুর সঙ্গে তিমিরের মিল দেখতে পেল রত্না। শান্তনু—রানীর স্বামী। রানীর ? নিজের মনেই হেসে ফেলে রত্না, কথাটা মনে পড়লেই। রানীর কেন, তারও তো হতে পারত!

রানী কি সে কথা বোঝে না ?

রানীর ওপর সত্যিই এক এক সময়ে মন বিষিয়ে ওঠে তার। তার চালচলন কথাবার্তা হাবেভাবে কোথায় যেন একটা গর্বের উঁকি দেখতে পায় রত্না। স্বামীর গর্বে গরবিনী। রানী কি বোঝে না, রত্না স্বেচ্ছায় শান্তনুকে ছেড়ে দিয়েছে, ইচ্ছে করলেই কেড়ে নিতে পারত, কেড়ে নিতে পারে!

হ্যাঁ, ইচ্ছে করলেই কেড়ে নিতে পারে, রত্না জানে।

আশ্চর্য! প্রথম প্রথম কী খারাপটাই না লাগত রত্নার! মা, বড় বউদি, ছোট বউদি—তুজনে এক জায়গায় হয়েছে কি শান্তনু আর রানীর কথা। কিন্তু সব আলোচনা রত্নাকে বাদ দিয়ে। যেন রত্না শুনলে রসিকতাটা উপভোগ করতে পারবে না, যেন রানীকে সে ঈর্ষা করে। তা না হলে যেদিন শান্তনুর ঘুম-ভাঙা মুখে কপালে বুকে সিঁদুরের দাগ দেখে সুলতা আর বড়-বউদি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল আর রানীকে সে কথা বলে ক্ষ্যাপাতে চাইছিল, সেদিন রত্না হঠাৎ এসে পড়ায় চুপ করে গেল কেন তারা ?

অথচ ব্যাপারটাকে সহজভাবে নেবার জন্যে কি অপরিসীম আগ্রহই না ছিল তার। সপ্রতিভ হবার জন্যে কত চেষ্টাই না করেছিল!

প্রথম প্রথম শান্তনুকে কি লজ্জাই পেত রত্না! আজ যেমন তিমিরের সঙ্গে চোখোচোখি হতে ভয় পায়, তেমনি। তবু বুঝেছিল এ-ভাবে দূরে দূরে থাকলে কোনদিনই শান্তনুর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। তার চেয়ে মন শক্ত করে সম্পর্কটা স্বাভাবিক করে তুলবে।

সেই যেদিন দ্বিরাগমনের পর রানী আর শান্তনু ফিরে এল, গাড়ি থেকে নামল দুজনে, সেদিন কী ভালোই না লেগেছিল রত্নার!

গাড়ি থেকে নামল রানী আর শান্তনু। দেখল রত্না, দূরে দাঁড়িয়ে, আধ-ভেজানো কপাটের আড়াল থেকে। বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে তো রানীকে! চমৎকার মানিয়েছে দুটিতে। আর এই কটা দিনেই যেন চেহারা ফিরে গেছে রানীর। মনের খুশী খুশী ভাবটা উপছে পড়ছে তার চোখে মুখে।

ছোট বোন—তার ছোট বোন রানী সুখী হয়েছে, এর চেয়ে সুখের আর কী হতে পারে! তার সুখ দেখে রত্নার ভাঙা জীবনটাও যেন জোড়া লাগতে চাইল। আর শান্তনুকে দেখেও মনে হল তার চেয়ে সুখী যেন কেউ নেই পৃথিবীতে।

কিন্তু, কী করে এমন হয়, কেন?

প্রথম যখন শান্তনু তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দেখতে এসেছিল রত্নাকে—হ্যাঁ, রত্নার সঙ্গেই তো বিয়ে হবার কথা ছিল শান্তনুর—তখন তো রত্নাকেই পছন্দ করে গিয়েছিল। কিন্তু রত্নার বদলে রানীকে পেয়ে তো এতটুকু অনুশোচনা নেই তার। কেন?

রত্নার মনে পড়ল, বাঁ হাতে শাঁখ নিয়ে দ্বিরাগমনের দিন ছোট-বউদি ছুটে গিয়ে শান্তনুকে হাতে ধরে নিয়ে এসেছিল গাড়ি থেকে নামিয়ে। তারপর সিঁড়ির রাস্তা দেখাতে দেখাতে বলেছিল, এস ভাই, এদিক দিয়ে এস। এখন চিনিয়ে-শুনিয়ে দিচ্ছি বটে, এর পর তুমিই আমাকে চেনাবে।

তারপর মা গিয়ে রানীকে নিয়ে এসে অন্য ঘরে বসিয়েছিল। বড়-বউদি. মা, ছোট-বউদি সবাই ঘিরে বসেছিল রানীকে।

কপাটের পাশে রত্নাকে দেখে মা ডেকে বসিয়েছিল।

আর চুপচাপ গম্ভীর প্রকৃতির সেই ছোট্ট মেয়েটি—রানী, রানী কী অনর্গল কথাই না বলে চলেছিল। তার শ্বশুরের মত মানুষ হয় না, ছোট ননদ কী ভালই বাসে তাকে, বড়জা বলেছে, আমি নাকি ঘর-আলো-করা বউ, বউভাতে সাত শো লোক খেয়েছে, কী সুন্দর মুক্তোর দুল দিয়েছে বিধবা খুড়-শাশুড়ী—

শুনে শুনে ক্রমশ বিরক্তি জমে ওঠে রত্নার মনে। এত গর্ব? এত আনন্দ?

সেখান থেকে উঠে এসেছিল রত্না, সঙ্গে সঙ্গে স্বলতাও। ছোট-বউদি বোধ হয় রত্নার অস্বস্তিটা বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল নতুন জামাইয়ের কাছে এখনই সহজ হতে না পারলে তার সামনে গিয়ে রত্না কোনদিনই আর দাঁড়াতে পারবে না। তাই রত্না উঠে আসতেই স্বলতা বললে, চল ঠাকুজ্জি, আলাপ করে আসি ঠাকুর-জামাইয়ের সঙ্গে।

রত্নাকে একরকম টেনেই নিয়ে এসেছিল স্বলতা।

এসে কেমন স্বচ্ছন্দে হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়েছিল স্বলতা, শান্তনুর একখানা হাত মুঠোর মধ্যে ধরে বলেছিল বউ পছন্দ হয়েছে?

হেসেছিল শান্তনু।

রত্নাকে দেখে মুখ নীচু করেছিল।

আর স্বলতা হেসে কুটিকুটি হয়ে রত্নাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, তোমার বড় শালী, নাও ভাব কর।

সে যে কী অবস্থা! তুজনেরই। খাটের বাজু ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল রত্না, শান্তনু যদি কিছু বলে, যদি কিছু উত্তর দিতে হয়। কিন্তু না, সেই যে হাত তুখানা নমস্কারের ভঙ্গিতে আধখানা উঠে নেমে গিয়েছিল তার, তারপর আর একটা কথাও কেউ বলতে পারে নি। না শান্তনু, না রত্না।

স্বলতা তখন পালিয়েছে রানীকে ডেকে আনবার নাম করে।

ছোট-বউদির আশায়, কখন সে ফিরে আসবে, ফিরে অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচাবে রত্নাকে এই ভেবে ঠায় দোরের দিকে তাকিয়ে

ছিল রত্না। হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনি ভান করে জানলাটা খুলে দিল। এক মুহূর্ত তাকিয়েছিল বাইরের দিকে, তারপরে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তবে কি এ অস্বস্তি কাটবে না ?

কী আশ্চর্য, রত্নার নিজেরই কেমন অদ্ভুত মনে হয়। এত যে লজ্জা, এত অস্বস্তি, অষ্টমঙ্গলার সময়ে কিন্তু সব উবে গেল।

সুলতাই এসে ডেকে নিয়ে গেল।

রত্না গিয়ে দেখলে রানী আর শান্তনু বসেছে পাশাপাশি। আর তাদের ঘিরে, তাদের গা ঘেঁষে মা, বড়-বউদি, সুলতা, পাড়ার মেয়ে-বউ দু-চারজন। আর সামনে কুলোর উপর একরাশ চাল ডাল, কয়েকটা ছোট ছোট মাটির ঘট। একজন চালে ডালে ভরে দেবে, আর-একজন ঢেলে দেবে। নিঃশব্দে করতে হবে দুটোই। এ সময়ে যত শব্দ হবে সংসারে তত অশান্তি।

একজন রোজগার করে আনবে, আর-একজন খরচ করবে। বেশ মজা তো! রত্নাও হেসে ফেলল দেখতে দেখতে।

শান্তনু ঘট ভরতে গিয়ে হয়তো গলা অবধি ভরল না, অমনি চিৎকার করে ওঠে সুলতা।—এই ছেলে, ভাল করে ভর্তি কর।

—বাঃ রে, এই তো ভরেছি। শান্তনু হেসে জবাব দেয়।

—বেশ, পাওনার বেলাও অমনি আধখানা পাবে বউয়ের কাছ থেকে। বলে হাসল সুলতা ঠোঁট টিপে।

আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসি চেপে মুখে কাপড় গুঁজে নিভাননী—রত্নার মা উঠে পালালেন।

এত হাসি কেন, আর লজ্জায় মা কেন পালাল, এই সরল কথাটা শুনে রত্না প্রথমটা বুঝতে পারে নি। রানীর কানের কাছটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল, দেখেই গূঢ় অর্থটুকু বুঝতে

পারল রত্না, আর বুঝতে পেরে তার নিজেরও কেমন যেন লজ্জা করল।

পর-মুহূর্তেই রত্নার মনে হল, কান লাল হওয়ার কথা মুখেই বলে সকলে, বইয়েও পড়েছে, কিন্তু কই, সত্যি কান যে এভাবে লাল হয়ে ওঠে, দেখে নি তো কখনও। ঠিক যেন কেউ একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে, রক্ত জমে গেছে এমনি লাল হয়ে উঠেছে কানের লতিটা, গালের পাশটা। লজ্জা পেলে সত্যি এমন হয়? তবে কি, সেই যেদিন—

রত্নার মনে পড়ে গেল তিমিরকে। একটা দিনের কথা। যেদিন প্রথম তাকে স্পর্শ করেছিল তিমির। সেই যেদিন কলেজ পালিয়ে দুজনে গিয়ে বসে ছিল ইডেন গার্ডেনের জলের ধারে। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ছিল দুজনে পাশাপাশি, একটা গাছের ছায়ায়। দুপুরের কড়া রোদকেও এতটুকু দুঃসহ মনে হয় নি। এক ঠোঙা চিনেবাদাম পাশে রেখে একটি একটি করে খোসা ছাড়িয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার মত করে একটি একটি করে কথা বলেছিল, থেমে থেমে, প্রতিটি কথাকে পরিপূর্ণ উপভোগের আনন্দে।

মন জানাজানি হলেও, পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ হলেও তখন অবধি শরীরের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয় নি রত্না। তাই হঠাৎ যখন তার কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টেনেছিল তিমির, তখন বড় বেশী লজ্জা পেয়েছিল সে। এত লজ্জা পেয়েছিল যে তিমিরের মুখের দিকে তাকাতেও পারে নি। শুধু মুচকি হেসে তিমিরের হাতখানা সরিয়ে দিয়েছিল অন্যদিকে তাকিয়ে।

ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল সেদিন। এত লজ্জা পেয়েছিল যে ফেরার পথে একবারও সপ্রতিভ হয়ে কথা বলতে পারে নি আর, সহজ হতে পারে নি।

সেদিন সেই প্রচণ্ড লজ্জার সময় তার কানও কি এমনি লাল হয়েছিল? তিমির দেখতে পেয়েছিল?

তারপর সেই কাশী বোস লেনের মেসের ঘরে—

না, সেদিন লজ্জা পায় নি রত্না। কেন পাবে সে লজ্জা? যদিও তিমিরের আলিঙ্গন থেকে সেদিন নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল সে, তবু—তবু সেও যে মনে মনে সেদিন জ্বলন্ত এক উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলে উঠতে চেয়েছিল, জ্বলেছিল, তা বোধ হয় কোনদিনই টের পায় নি তিমির। তার কোমল বুকের মধ্যে একটি স্পর্শকাতর গোলাপের মত যে প্রেমকে সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল, তাকে ছাই করে দিতে চায় নি রত্না। চায় নি বলেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

আশ্চর্য! একটি অসংযত মুহূর্তে সেই সুন্দর সকালের মত হৃদয়কে ভেঙে দিয়ে গেল তিমির, সেই গোলাপের পাপড়িগুলো দলে দিয়ে গেল, সেই ক্লান্ত-মধুর সুরের রেশ ভেঙে দিয়ে গেল। সব হারিয়েও যা ছিল তার জীবনের পরম সঞ্চয়, তিমির ক্ষণিকের লুব্ধতায় ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল।

তিমিরকে হারিয়েও বুঝি এত বিভ্রান্ত বোধ করে নি রত্না। এত বিমর্ষ হয়ে পড়ে নি।

সুলতার ডাকে তন্ময়তা ভেঙে গেল তার।

সুলতা সহাস্যে ডাকলে, এখানে এস ঠাকুজ্জি, সুতো খোলা হবে, এস এখানে।

সুতো খোলা?

ও, হ্যাঁ। শান্তনু আর রানীর মণিবন্ধে বাঁধা ওই হলদে সুতোর বাঁধন খুলে নেওয়া হবে। এ অনুষ্ঠান আগেও দেখেছে রত্না। আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু জীবনের, স্মৃতির সুতো খুলতে খুলতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে।

দুটো দল হয়ে বসেছে সকলে। কেউ শান্তনুর দিকে, কেউ রানীর দিকে। সুতোটা নিয়ে সুলতা কখনও শান্তনুর শরীরের

কোথায় লুকিয়ে রাখছে, খুঁজে দিতে বলছে রানীকে ; আবার কখনও বড়-বউ সেটা লুকিয়ে রাখছে রানীর কাপড়ের মধ্যে, খুঁজে দিতে বলছে শান্তনুকে।

পরস্পরের শরীর স্পর্শ করবার প্রাথমিক সঙ্কোচ আর খুঁজে না-পাওয়ার ব্যর্থতা দেখে অট্টহাসে হেসে উঠছে সকলে। সুলতা ধমক দিচ্ছে, বড়-বউ ধমক দিচ্ছে : তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের কর, তা না হলে নিস্তার নেই।

হাসাহাসি আর কৌতুকের মধ্যে রত্নাও কখন শান্তনুর হাতটা ধরে ফেলেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর যেন তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

তারপরও কতবার এসেছে শান্তনু, রত্নার কাছে এসেছে। কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন কথার স্রোত টেনে কাটিয়েছে রত্না। কাছে বসেছে। আর কী এক অবোধ্য আনন্দ পেয়েছে যেন।

অকারণে শান্তনুর সুপুষ্ট বাহুতে একটা চিমটি কেটে চিমটি-কাটার মত কোন কথা বলে, কখনও পাশাপাশি বসে লুডো খেলতে খেলতে লুডোর দান চুরি করেছে বলে শান্তনুর পিঠে একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে রত্না, সিনেমা দেখতে গিয়ে কতবার মধ্যবর্তী আসনে রানীকে বসিয়েও বার বার শান্তনুর দিকে মুখ বাড়িয়ে আজেবাজে কথা বলেছে। আর ভালো লেগেছে রত্নার। ভালো লেগেছে।

কেন তা রত্না নিজেও বুঝতে পারে নি। এক-একদিন যখন রাত্রে ঘুম আসতে চায় নি চোখে, একা একা মায়ের পাশে শুয়ে গরমে ছটফট করেছে রত্না, কেমন একটা অবোধ্য যন্ত্রণা অনুভব করেছে বুকের ভেতর, তখন হঠাৎ হয়তো একটা সন্দেহ উঁকি দিয়ে গেছে তার মনে। তবে কি শান্তনুকে—

ছি-ছি, নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে সে। এ-কথা সে ভাবল কী করে? কখনও না, কখনও না। শান্তনুকে সে তো

স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া, রানীকে—রানীর সঙ্গে এমন প্রবঞ্চনার খেলা খেলবে কী করে রত্না! তার সেই ছোট বোনটি, ছোট্ট বোনটি! রানীর মুখটা মনে পড়তেই মনে মনে যেন সে সেই ক্লান্ত সুন্দর সুখী মুখখানাকে বুকে চেপে ধরেছে অসীম স্নেহে।

না, রত্নার জীবনে শুধু একজনই এসেছিল, একজনই আছে।

তিমিরের কথা মনে পড়তেই অন্ধ আক্রোশে জ্বলে উঠত রত্না। কী এক হিংস্র উত্তেজনায় কেঁপে উঠত তার সারা শরীর। তবু বুঝতে ভুল হত না, তিমিরকে সে ভালবাসে, ভালবাসবে।

তিমিরদের গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর সব স্বপ্ন ধুলোয় লুটিয়ে গেল তার।

প্রথম প্রথম কয়েকটা দিন একটা আতঙ্ক নিয়ে কাটিয়েছে রত্না। ভয় পেয়েছে, হয়তো কলকাতায় ফিরে এসেই তিমির আবার আসবে, এসে দেখা দেবে রাহুর বীভৎস চোখ নিয়ে। সে চোখের সামনে এগিয়ে যেতে পারবে না সে, মুখ তুলে তাকাতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না।

কতদিন গুমরে গুমরে কেঁদেছে রত্না, কেঁদেছে আর কেঁদেছে। তার অনেক যত্নের ছোট্ট চারাগাছটিকে এমন ভাবে নষ্ট করে দিল কেন তিমির? কেন? কেন?

সেই আগেকার তিমিরকে আর যেন ভাবতে পারছে না রত্না। সেই হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলির মধুর রোমাঞ্চময় স্মৃতিটুকু যেন আর কোন সুর তোলে না মনে।

এ এক অন্য তিমির বার বার এসে দেখা দিতে চায়। যে তিমিরের বিরুদ্ধে সে এতদিন এক-সমুদ্র আক্রোশ পুষে রেখেছিল, সে তিমিরকে রত্না মনে মনে ভালবাসত। কিন্তু এ এক অন্য তিমির। অন্য ভালবাসা। একে মনে মনে সে ঘৃণা করে, একে ক্ষমা করতে পারে না সে। অথচ এ তিমিরের প্রতি তার আকর্ষণ যেন আরও তীব্র। যাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসত, সে যদি তার হৃদয়কে ভেঙে দিয়েই গেল তবে তাকে জীবন দিয়ে যৌবন দিয়ে ভালবাসতে চায় কেন? যৌবনও কি আরও তীব্র প্রেম, আরও দুঃসহ জ্বালা? যৌবনও কি অন্য এক প্রেম?

দিনে দিনে তিমিরের স্মৃতি বুঝি মুছে যায় মন থেকে। রত্না যেন তার যৌবনকে ভালবাসতে চায়।

তাই কি ?

হয়তো তাই, তা না হলে এত সহজে কী করে রাজী হল রত্না। যৌবনকে পূর্ণতা দিয়েই কি জীবনকে পূর্ণ করতে চাইল ?

কে জানে !

তিমিরদের গ্রাম থেকে কলকাতায় ফিরে এসে কেমন যেন অসহায় নিঃসঙ্গ লাগল রত্নার। সব হারিয়েও একটি মধুর স্মৃতি ছিল তার সঙ্গী। তিমিরের বিরুদ্ধে একটা অন্ধ আক্রোশ ছিল তার জীবনের বৃত্ত। সেটুকুও ছিঁড়ে গেল যৌবনের সম্মোহনে। বড় বেশী অসহায় মনে হল তার নিজেকে, উদ্দেশ্যহীন—সুতো-ছেঁড়া ঘুড়ির মত। যৌবনের বাতাসে গা ভাসিয়ে চলতে ইচ্ছে হয়।

নিজেকে এত বেশী ভয় পায় নি কখনও রত্না। নিজের ওপর এমন ভাবে আস্থা হারায় নি।

তিমির, শান্তনু, অনুপম—সব যেন এক হয়ে গেছে। এতকাল তার চোখে এরা সবাই ছিল পরস্পর থেকে পৃথক। মানচিত্রের গায়ে বিভিন্ন রঙে রাঙানো এক একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের মত। স্কুলে ভূগোল পড়তে পড়তে একদিন বিস্মিত হয়েছিল রত্না। ভারতবর্ষের মানচিত্রে দেখেছিল এক-একটি প্রদেশের এক-একটি রঙ। অথচ পৃথিবীর মানচিত্রে সেই ভারতবর্ষের গোটাটাই ছিল এক রঙ, একই রঙ। তবে কি তার হৃদয়ের মানচিত্রেও এমনি নানা বর্ণের মিছিল—যৌবনের মহাদেশে এসে এক হয়ে গেছে ? ঠিক সেই স্কুলে পড়ার দিনগুলির মতই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সে জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতায়।

নিজেই বুঝতে পারে নি অনুপমকে কেন তার ভালো লাগল। ভুল বুঝেও কেন সে এত সহজে সায় দিল।

কলকাতায় ফিরে আসার বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা।

রত্নার মনের আতঙ্ক কেটে গেল। না, তিমির আসবে না,

এসে দাঁড়াবে না তার সামনে। প্রকাশবাবু একদিন তিমিরের মেস্ অবধি গিয়েছিলেন, একদিন আসতে বলে এসেছিলেন তাকে। ভেবেছিলেন আসবে সে।

কিন্তু তিমির এল না।

এল যে তার নাম অনুপম। শান্তনুর বন্ধু।

শান্তনু এসেছে শুনেই ছুটে গেল রত্না, নীচের বসবার ঘরটিতে। ভেবেছিল, রানীও বুঝি এসেছে শান্তনুর সঙ্গে।

গিয়েই অস্বস্তি আর লজ্জার মধ্যে পড়ে গেল সে অনুপমকে দেখে।

কিছু না বলেই পালিয়ে আসছিল রত্না। শান্তনু ডেকে আলাপ করিয়ে দিল।

কিন্তু তখনও অস্বস্তি কাটল না রত্নার। তাকে চুপচাপ বসিয়ে রেখে শান্তনুকে ওপরে ডেকে নিয়ে এল।

সুলতা আর রত্না সারাক্ষণ ঘিরে রইল শান্তনুকে। রঙ্গ, রসিকতা। দু-একটা খুচরো প্রশ্ন। রানী কেমন আছে, কখন আসবে? সংসারের সংখ্যা বাড়বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কি না?

বড় মজার মজার কথা বলে সুলতা, আর রত্নাও হেসে লুটিয়ে পড়ে।

রত্না একসময় হেসে উঠে বলে, এলেন যদি তো বন্ধুটিকে জুটিয়ে নিয়ে এলেন কেন? বেচারা একা-একা বসে আছে।

সুলতা হাসলে।—থাক্ গে। আমাদের লোককে নিয়ে আমরা ব্যস্ত, কী বল?

কিন্তু রত্না যেন এ-কথায় সায় দিতে পারল না। বেচারী একা বসে থাকবে?

চা-খাবার নিয়ে এসে শান্তনুর সামনে একসময় নামিয়ে রাখল

রত্না, তারপর সুলতা-বউদিকে বললে, ও ভদ্রলোককে তুমি দিয়ে এস।

সুলতা হাসল।—তুমি দিয়ে এস, আমি কেন যাব?

বাধ্য হয়েই রত্নাকে আসতে হল। বউদি যা মানুষ, শান্তনুকে নিয়ে এমন মেতে উঠেছে হয়তো চাটুকুও পা্বে না ভদ্রলোক।

কিন্তু বেরিয়ে এসে কেমন অস্বস্তি বোধ করলে রত্না। ভাবলে, ঝিয়ের হাতেই পাঠিয়ে দেবে। কী আর এমন দোষ হবে! কিন্তু তাতে যে শান্তনুরই অপমান।

বন্ধুটি ফিরে গিয়ে যা-তা বলবে হয়তো। বলবে, এরা ভদ্রতা জানে না। তোর শ্বশুরবাড়ির লোকগুলো কী অভদ্র রে!

সাত-পাঁচ ভাবল রত্না। তারপর নিজেই একসময় চায়ের কাপ আর এক গ্লাস জল নিয়ে গিয়ে রাখল অনুপমের সামনে।

কাপটা টেনে নিয়ে মুখ তুলে তাকাল অনুপম রত্নার মুখের দিকে। হেসে বললে, চায়ের সঙ্গে জলও দেন নাকি আপনারা?

আরে, তাই তো। এ কী করেছে সে!

তবু অপ্রতিভ হল না রত্না। মৃদু হেসে বললে, চায়ের সঙ্গে টা দিই, টায়ের সঙ্গে জল। দাঁড়ান···

বলে ছুটল রত্না, খাবারের রেকাবিটা এনে রাখলে অনুপমের সামনে।

অনুপম বললে বসুন।

রেকাবিটা নামিয়ে দিয়েই কোনরকমে পালাবে ভেবেছিল রত্না। বিপদে পড়ল। বসল চেয়ার টেনে নিয়ে।

—কলেজ খোলে নি আপনাদের? জিগ্যেস করল অনুপম।

—হুঁ। ছোট্ট একটা উত্তর দিল রত্না। অর্থাৎ এখানে বসে থাকতে ভালো লাগছে না ওর, কথা বলতে উৎসাহ নেই। এতক্ষণ না জানি শান্তনু কত মজার মজার কথা বলছে!

উসখুস করছিল রত্না। হঠাৎ 'আসছি' বলেই পালিয়ে এল ও। এসে দেখলে, শান্তনু আর সুলতা হাসছে শব্দ করে। আর মা দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

কী যেন বলছিলেন নিভাননী। রত্নাকে দেখেই চুপ করে গেলেন। তবু যেটুকু কানে গিয়েছিল, রত্না বেশ বুঝতে পারলে তার বিয়ের কথা হচ্ছিল।

মা বলছিল, বিয়ে তো দিতেই হবে, তোমার কী মত বল?

বিয়ে? অনুপম? অনুপম নয় তো আর কে? শান্তনুই বুঝি এ-কথা তুলেছে! সমস্ত শরীর রাগে জ্বলে গেল তার। বিয়ে? বিয়ের কথা উঠলেই সেই দিনটার কথা, সেই রাতটার কথা মনে পড়ে যায় রত্নার।

শান্তনু চলে যাওয়ার পরেও ওর মাথায় ওই একটা কথাই ঘুরতে লাগল। 'বিয়ে তো দিতেই হবে, তোমার কী মত বল।' যেন শান্তনুর মতটাই বড় কথা, মা-বাবার মতটাই সব, রত্না কেউ নয়। রত্নার ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই, মত-অমত নেই। আর তাও কিনা অনুপমের সঙ্গে? ওই অনুপম? ভাবতেই নিজের মনে হেসে ফেলল রত্না।

হাসল, কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না শান্তনু চলে যাবার পরেও।

ছাদে এসে দাঁড়াল ও আলসে ধরে, সামনের গলিটার দিকে তাকিয়ে।

নিষ্প্রদীপ কলকাতা। রত্নার জীবনের মত। কোথাও আলো নেই। শুধু আলোর চোখে কালো কালো ঠুলি, জমাট-বাঁধা অন্ধকার।

বড় রাস্তার ধারে গর্ত খুঁড়ে বানানো একটা স্লিট-ট্রেঞ্চ, কতকগুলো বাচ্চা ছেলে খেলা করছে তার ভিতর নেমে। আবছা

আলোয় তাদের ছায়া-ছায়া শরীরগুলো দেখা যাচ্ছে। অন্যমনস্ক হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে ছিল রত্না।

হঠাৎ পিঠের ওপর হাতের স্পর্শে চমকে উঠল।—ঠাকুজ্জি।

—তুমি? ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

হাসল সুলতা।—একটা কথা জিগ্যেস করব?

—কী?

—বাবা কদিন-ধরেই জিগ্যেস করতে বলছেন।

—কী বল না, অত ভণিতা কেন? একটু রুষ্ট স্বরেই বললে রত্না। ছোট্ট খুকিটি নাকি ও। বোঝে না কী জিগ্যেস করবে ছোট-বউদি? জানে না, ভেতরে ভেতরে কী ষড়যন্ত্র চলছে! কেন অনুপমকে ডেকে এনেছে শান্তনু?

শান্তনুর ওপরও চটে গিয়েছিল রত্না।

সুলতা ধীরে ধীরে বললে, তুমি কি বিয়ে করবে না?

চুপ করে রইল রত্না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, জানি না।

—না, উত্তর দাও।

উত্তর দেয় নি রত্না। কিন্তু 'না' বলতেও যেন তেমন জোর পায় নি মন থেকে। সত্যিই তো, কেন বিয়ে করবে না সে? কেন এভাবে নিজের জীবনকে নষ্ট করবে? আর অনুপম? কই, তিমিরের চেয়ে কোনও অংশে হীন তো নয় অনুপম। হলেই বা কী হত! যা হারিয়ে গেছে, শুধু তাকেই খুঁজে বেড়াবে নাকি সে সারা জীবন?

তা ছাড়া—তা ছাড়া তিমিরকে একটা আঘাত দিতে চায় সে, অপমান করতে চায়, তাকে বোঝাতে চায় তাকে বাদ দিয়েও রত্নার জীবন ব্যর্থ নয়।

ছি-ছি, এ-সব মিথ্যে আক্রোশের কথা ভাবছে কেন ও! কী যায়-আসে তার, তিমির কি ভাবল না ভাবল তার ওপর! যে

তিমিরকে ও ভালবাসত, সে তিমির হারিয়ে গেছে ওর মন থেকে। যৌবনের স্পর্শে ভুল ভেঙে গেছে ওর। তিমির আর অনুপম এক, এক। কোন ভেদ নেই, পার্থক্য নেই।

রাত্রে খেতে বসে সুলতা আবার জিগ্যেস করলে, কী হল ঠাকুজ্জি, যা জিগ্যেস করলাম তখন? উত্তর দাও? উত্তর দাও।

রত্না হাসল, হাসবার চেষ্টা করল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তোমরা যা ভাল বোঝ।

—তাই বল। খিলখিল করে হেসে উঠল সুলতা। সে আঁচিয়েই ছুটল প্রকাশবাবুর ঘরে।—বাবা, বাবা!

তার পরের কথাটা আর শুনতে পেল না রত্না। খেয়ে-দেয়ে এসে জানলার কাছে দাঁড়াল রত্না। মনের মধ্যে তখন গুনগুন করছে একটি কথা—একটি নাম।

না, ভালোই করেছে রত্না, সবচেয়ে সরল উত্তরটাই তো দিয়েছে সে কী হবে এমন ভাবে নিজের জীবনটাকে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে দগ্ধ করে।

নতুন করে জীবনের মোড় ঘোরাতে চায় সে। জীবনকে পরিপূর্ণ করতে চায়।

—কি ভাবছ?

ফিরে তাকাল রত্না, সুলতার প্রশ্নে।

পান চিবোতে চিবোতে এসে দাঁড়িয়েছে সুলতা, রত্নার পিছনে। বাঃ, ঠোঁট দুটি তো বেশ লাল সুলতা-বউদির!

—তোমাকে আজ কী সুন্দর দেখাচ্ছে ছোট-বউদি!

—তাই বুঝি? হাসল সুলতা। বললে, তোমাকেও দেখাবে।

লজ্জা পেল রত্না। চুপ করে গেল। আর সুলতা পরম সুহৃদের অন্তরঙ্গতায় রত্নার কাঁধে হাত রেখে পাশে এসে দাঁড়াল।

বললে, কী দুশ্চিন্তা যে ছিল, বাঁচালে ঠাকুজ্জি। তোমার মত না জেনে এতটা এগিয়ে গিয়েছিলেন বাবা···

—এগিয়ে গিয়েছিলেন? সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল রত্না।

সুলতা হাসল। বললে, বাঃ রে, চিঠিপত্র চলছে কি আজ থেকে নাকি? সবই তো প্রায় ঠিকঠাক, শুধু ছেলের এখন পরীক্ষা শেষ হয় নি বলেই একটা বছর পিছিয়ে দিতে চেয়েছেন বিয়েটা।

—বিয়ে, বিয়ে! আর কি কোন কথা নেই তোমাদের? হঠাৎ যেন বিরক্ত হয়ে-উঠল রত্না।

এসে শুয়ে পড়ল সে বিছানায়।

ক্ষীণ একটা আলো জ্বলছে ঘরে, বাইরে গিয়ে সে-আলো যাতে রাস্তায় না পড়ে তাই শেড দিয়ে ঢাকা। ব্ল্যাক-আউটের রাত। কোথাও কোন আলো নেই। সারা শহর যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। কোলাহল নেই, আনন্দ-উল্লাস নেই। তিমিরদের গ্রামের রাত্রির মত শুধু জোনাকি-জ্বলা স্তব্ধতা আর অন্ধকার।

রত্নার জীবনটাও।

সুলতাও দরজা বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়ল আলোটা নিবিয়ে দিয়ে, ছেলেটাকে কোলের কাছে কাঁথায় শুইয়ে।

পাশাপাশি। চুপচাপ!

পাশ ফিরল সুলতা, একটা খসখস শব্দ হল।

পাশ ফিরল রত্না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যেন।

বারান্দার আলোটা এসে ঢুকেছে এক ফাঁকে উঁকি দিয়ে। বড় বউদি এখনও শুয়ে পড়ে নি, পান সাজছে প্রকাশবাবুর জন্যে।

—ঘুমুলে? রত্নার পিঠের ওপর সুলতার হাতখানা এলিয়ে পড়ল। ক্লান্ত ভারী নরম হাতখানা।

না। ফিসফিস করে বললে রত্না।—ঘুম আসছে না।

আসবে। একটা চাপা হাসি।

জোরে বুক ভরে নিশ্বাস টানল রত্না।

চাপা শান্ত ভাঙা-ভাঙা ঘুম-জড়ানো গলায় সুলতা বললে, সবারই ছিল।

—কেন? রত্নার কণ্ঠস্বরও ঠাণ্ডা আর ক্লান্ত।

—তুমি নাকি···

—কী?

—বিয়ে করতে চাইবে না।

—কেন?

—বিয়েতে তোমার হয়তো মত নেই।

—তাই নাকি?

আধো-ঘুম আধো-জাগা জড়তায় হাসল সুলতা।—জানি। কিন্তু ওঁরা ভেবেছিলেন···

—ওরা কে? কারা?

—বাবা···

—আমার?

—হ্যাঁ। ভেবেছিলেন, তুমি কাউকে হয়তো···

—ভালবাসি?

খিলখিল করে হেসে উঠল সুলতা।

সারা বাড়ি স্তব্ধ হয়ে গেছে, আলো নিবে গেছে। শুধু বারান্দার আলোটা জ্বলছে এখন। আর ঠুকঠুক করে একটা আওয়াজ হচ্ছে, বুড়ী ঝি-টা ছোট্ট হামানদিস্তেতে পান পিষছে। ঠুকঠুক, ঠুকঠুক আওয়াজ।

—বউদি!

—উঁ।

—এই ছোটবউদি!

সাড়া নেই। অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে হাত বাড়াল রত্না।

ঘুমিয়ে গেছে সুলতা। বাচ্চাটাকে কোলে টেনে নিয়ে দুধ দিতে ঘুমিয়ে গেছে।

কী বিশ্রী লাগছে রত্নার! না, ভালোই লাগছে। কিন্তু কত কী যে জানবার ছিল তার, কত কী জিগ্যেস করতে চেয়েছিল।

অনুপম! বেশ তো সপ্রতিভ মানুষ। রত্না বুঝতে পেরেছিল, অনুপম তার সঙ্গে আর-একটু যেন ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল। আরও একটু কাছাকাছি বসে কথা বলতে চেয়েছিল। কত স হবে ও্ব! শান্তনুর চেয়ে বড় নয়? বড়ই। এখনও পড়াশু না শেষ হয় নি তবু?

এ কী, সর্বাঙ্গ ঘেমে গেছে রত্নার। আন্দাজে আন্দাজে মাথার কাছে হাত বাড়াল।

কাঁসার গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে জল খেল।

বিয়ের পর একদিন যাবে তিমিরের কাছে। খুব হাসবে, কথা বলবে। হ্যাঁ, অনুপমকে সঙ্গে নিয়েই যাবে। অনুপম কি কিছু সন্দেহ করবে? করলেই বা। কাউকে ভয় পায় না? নিজেকেও না। জীবনের কাছে সে যে কিছুই আশা করে না, ভয় পাবে কেন? যে আশা করে, যে স্বপ্ন দেখে, ভয় তো তারই। তিমিরকে শুধু দেখাতে চায় কত সুখী সে, কত আনন্দ! না, কী হবে তিমিরকে আঘাত দিয়ে। তিমিরকে ও তো ভুলেই গেছে, ভুলে যেতে চায়। ভুলে যাওয়া কি খুব কঠিন? কত মেয়েই তো ভুলে যায়, পুরুষরাও। অনুপম সুন্দর, অনুপম কত সহজ আর সরল। অনুপম যদি ওকে ভালবাসে, রত্নাও ভালবাসবে তাকে।

পারবে কি? পাশাপাশি দাঁড়িয়েও পরস্পর থেকে দূর মনে হবে না তো! তিমিরের স্মৃতিটুকু এসে উঁকি দেবে না তো! যদি দুটি মন এক না হয়?

দেয়ালে ওটা কী? কিসের ছায়া?

না, এমনভাবে অনিশ্চিতের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত হবে না। একটা গোপন লজ্জা নিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজেকে কতদিন

য় রাখবে সে? যৌবনের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতাটুকু বার বার বীভৎস চোখ নিয়ে তাকাবে না তো?

নুপম! বেশ নাম। মিষ্টি। অনুপমের হাসিটা বড় সুন্দর। কল্পনার চোখেও তাকে বুকের কাছটিতে আনতে পারছে না মনে গোপনে তবে কি সত্যিকার কোন আগ্রহ নেই তার?

তিমিরকে মনে পড়ছে। সেই যেদিন চায়ের দোকানটায় গিয়ে ল। দু-পেয়ালা চা-কে সাক্ষী রেখে কথা বলেছিল, হেসেছিল, লুটিয়ে পড়েছিল। কত কথা, কত হাসি! চায়ের পেয়ালা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।

াণ্ডা ছাইয়ের গাদায় কুস্তি করতে করতে ছেলে দুটো এসে পয়সা ছিল।

আর সেই বউটা? কলেজ থেকে বেরিয়ে এ-গলি সে-গলি া বুকে একরাশ বই চেপে বউটা দোতলার বারান্দা দেখে হাসত, কী বলাবলি করত নিজেদের মধ্যে!

দেয়ালে কী দুলছে ওটা? একটা বৃত্তের মত। একটা ফাঁস। র দড়ির মত মনে হচ্ছে। কী ওটা, কিসের ছায়া! গলা য় আসছে রত্নার। ভয়ে, আতঙ্কে!

নুপম! ওই ছায়াটা কি অনুপমের? তার নিজের ভবিষ্যতের ছা? কে জানে!

নে রত্না! নিজেকে! নিজেকেও সে বুঝতে না, চিনতে পারছে না।

কি চিনতে পারছে? দেখতে পাচ্ছে? ওই ছায়াটার মত। মত।

বিয়ে করে রত্না কি সুখী হতে পারবে না? এই তিমিরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন তার? তিমিরের বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে কেন?

না, না, না।

উঠে বসল রত্না। অসহ্য গরম। অসহ্য।

কী করবে ও এখন! এই এত রাত্রে!

সুলতা ঘুমিয়ে পড়েছে। রত্নার চোখে ঘুম আসছে না। ডা[illegible]ব, ডেকে তুলবে সুলতাকে? বলবে?

থাক, কাল সকালেই বলে দেবে রত্না। বলবে, এ বিয়েতে ম[illegible] নেই তার। এ বিয়ে তার জীবনকে দুঃসহ করে তুলবে।

ছায়াটা নড়ছে। ছায়াটা কাঁপছে। ঠিক একটা ফাঁসির দ[illegible] মত। ফাঁসটা কাছে এগিয়ে আসছে নাকি?

গলা বন্ধ হয়ে আসছে রত্নার! নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। যেন গলাটা চেপে ধরেছে তার। বুকের উপর একটা ভারী পা[illegible] চেপে বসেছে।

না, সুলতার ঘুমন্ত হাতখানা পাথরের মত ভারী [illegible]র ঠা[illegible] ঠাণ্ডা আর ক্লান্ত।

হাতটা সরিয়ে দিল রত্না।

কিন্তু দেয়ালের ছায়াটা থেকে চোখ ফেরাতে পারল না।

কী ওটা? দুলছে! বীভৎস!

ভয়ে চোখ বুজল রত্না। চোখ বুজল। ভয়ে, না ক্লান্তি[illegible] ক্লান্তিতে; না ঘুমে?

ঘুম। আঃ, ঘুম আসছে। কী চমৎকার ঘুম! [illegible] তৃপ্তির, নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব ঘুম। ঠাণ্ডা। নরম।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল রত্নার। সুলতার ডাকে।

—ওঠ, ওঠ। আর ঘুমোয় না।

উঠল, চোখ মেলে চাইল রত্না।—কী?

—চিঠি লিখে দিলেন তিমিরের বাবাকে।